আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার ঊনবিংশ গ্রন্থ

বিল্বদল

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত

শ্রাবণ—১৩২৪

১

চুনীলাল দত্ত যে দিন বিবাহ করিয়া আসিল, সেদিন আকাশে খুব মেঘ ছিল, এবং দেবতার বজ্র মুহুর্ম্মুহুঃ গর্জ্জন করিতেছিল !

চুনীলাল দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ; গান করিতে, বাজাইতে, সে অদ্বিতীয় ! লোক সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা অতুলনীয় ; গ্রামের যুবকেরা চুনীর পার্শ্বচর ; তাহারা তাহাকে অনুকরণ করে, অনুসরণ করে ! চুনীর কথায় তাহারা মাঘের রাত্রিতেও 'সরকার ঝির' শীতল জলে ডুব দিয়া আসিতে পারে !

চুনীলাল একটু কবি, পরিহাস রসিক, সর্ব্বোপরি তাহার শারীরিক শক্তি দেশ বিখ্যাত ! এ হেন চুনী বিবাহ করিয়া আসিল ;—এবং সেদিন আকাশে মেঘ ছিল ও দেবতার বজ্র গর্জ্জন করিতেছিল !

চুনী তাহার সোণার চশ্‌মা জোড়াটা নাসিকার উপর যথাস্থানে রক্ষা করিয়া একখানি চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। বুকের কাছে এক গাছি সূক্ষ্ম স্বর্ণশৃঙ্খল দুলিতেছিল। এমন সময়ে

একটি বালিকা,—চুণীর দূর সম্পর্কীয়া ভগিনী, নববধূকে গৃহদ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল!

তখন মুষলধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে, এবং নিকটবর্ত্তী ডোবার মধ্যে ভেকের দল ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়াছে! সে যাহা হউক্ চুণীলাল একটু নাটকীয় ভাবে উঠিয়া দরজার কাছে আসিল;—নববধূ বিন্দুর হাত ধরিয়া তাহাকে গৃহমধ্যে টানিয়া আনিল! চুণীর ভরসা ছিল, বাহিরে এই দারুণ বর্ষায় কেহই তাহাদের প্রথম আলাপ শুনিবার অপেক্ষায় বসিয়া নাই! টেবিলের কাছে টানিয়া আনিয়া চুণী বিন্দুর অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিল। বিন্দু দ্রুতহস্তে অবগুণ্ঠন যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিল।

চুণী দেখিল, প্রকাণ্ড চক্ষু দুইটি; দেবীপ্রতিমার চক্ষুর মতই আকর্ণ বিশ্রান্ত মুখখানি বেশ; এই সুন্দর মুখের অধিকারিণীর স্বামী হওয়ার মধ্যে একটা গৌরব আছে!

টেবিলের কাছেই খাটের উপর শয্যা আস্তৃত ছিল; ঘরের চাল ভেদ করিয়া শয্যার একটা স্থানে টীপ্ টীপ্ করিয়া জল পড়িতেছিল! চুণীর সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। বিন্দু অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া তাহা দেখিল, এবং শয্যাখানি একটু সরাইয়া যে স্থানটায় বৃষ্টির জল পড়িতেছিল, সেইটুকু ভাঁজ করিয়া রাখিল, তারপর একখানি ভিজা তোয়ালে সেখানে যথোপযুক্তরূপে রাখিয়া দিল!

চুণী বিন্দুর কার্য্য দেখিতেছিল; সে বুঝিল, এই কর্ম্মনিষ্ঠা নারীটিকে লইয়া কবিতা চর্চ্চা চলিবে না! এ গৃহস্থ ঘরের কন্যা, স্বামীর সংসারে লক্ষ্মীটির মতই, একদিন শুভমুহূর্ত্তে প্রবেশ করিয়া

তাহার নির্দ্দিষ্ট আসনখানি অধিকার করিয়া লয়; এবং সেখানে সে মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সগৌরবে প্রতিষ্ঠিতা থাকে!

চুণী তাহার উচ্ছ্বাসে একটা বাধা পাইল। মৃদুস্বরে ডাকিল, "বিন্দু,"—

বিন্দু উত্তর দিল না! সে যে আহ্বান শুনিতে পাইয়াছে, এমন কোনও লক্ষণও প্রকাশ করিল না। আকাশে তখন দেবতার বজ্র গম্ভীর নির্ঘোষে গর্জ্জন করিতেছিল। সে গর্জ্জনে ঘরের জানালা, কপাট, টেবিল, লণ্ঠন সমস্তই যেন কাঁপিতেছিল। আলোটা আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়া চুণী এবার একটু বড় করিয়াই ডাকিল "বিন্দু,"—

বিন্দু চকিতভাবে অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া চুণীর মুখের দিকে চাহিল, তারপর উঠিয়া গলার উপর দিয়া অঞ্চল ঘুরাইয়া আনিয়া, দুইপাণি যুক্ত করিয়া চুণীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল!

চুণী তাহার দুইহাত ধরিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিল, কহিল, "একি! প্রণাম কর্‌লে কেন, বিন্দু?"

বিন্দু নিম্নস্বরে কহিল, "বৌদিদি ব'লে দিয়েছেন, শোবার সময় ও উঠ্‌বার সময় প্রণাম করতে!" কথাটা বলিয়াই বিন্দু তাহার অবগুণ্ঠনটা একটু বেশী করিয়া টানিয়া দিল, এবং মুখ ফিরাইয়া লইল! একটা বিষম লজ্জা আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছিল! চুণী হাসিয়া উঠিল এবং বিন্দুর মাথার কাপড়টা ফেলিয়া দিবার জন্য আর একবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া কহিল, "কবে দেখ্‌ছি, আমার পা' ধোয়াইয়া, চুল দিয়া মুছাইয়া দিবে!"

বিন্দু একটু হাসিল, মনে ভাবিল, সে ত নারীর সৌভাগ্য !

চুণী কল্পনায় যে আদর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বিন্দুর মধ্যে তাহা যেন খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তবু বিন্দুর সরলতামাখা স্বপ্নময় দৃষ্টিটুকু, সুন্দর মুখখানি, ভক্তির অকপট অভিব্যক্তিটুকু, চুণীর মন্দ লাগিতেছিল না !

বাহিরের অবিশ্রান্ত বর্ষণ ও মেঘ গর্জ্জন তাহাদিগকে পরস্পরের কাছে যেন একটু বেশী করিয়া নিকট করিয়া দিতেছিল।

নববিবাহিতদিগের মধ্যে, লজ্জার প্রথম বাধাটা কাটিয়া গেলে পরস্পর পরস্পরকে ভাল করিয়া চিনিয়া লইবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে ! জীবনের যে পথটা তাহারা এ পর্য্যন্ত অতিবাহন করিয়া আসিয়াছে, তাহারই একটা ইতিহাস পরস্পরের কাছে প্রথম পরিচয়ের মুহূর্ত্তেই প্রকাশ করিবার জন্য অন্তর আকুল হইয়া উঠে ! কে কোথায় কতটুকু বেদনা পাইয়াছে, কবে কোন্ একটু সুখের অনুভূতিতে হৃদয় পুলক-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সবটুকু একেবারে নিঃশেষ করিয়া না বলিয়া ফেলা পর্য্যন্ত কোনও মতেই স্বস্তি পায় না !

বাহিরের প্রবল বর্ষণ ও অবিশ্রান্ত গর্জ্জন চুণী ও বিন্দুকে একেবারে সমস্ত জগৎ হইতে বিযুক্ত করিয়া লইয়া, এই ক্ষুদ্র গৃহখানির মধ্যে এমন একটি নির্জ্জন অবসর প্রদান করিল, যে তাহারা আজিকার একটি রাত্রির মধ্যেই আপনাদের পরিচয়টিকে সম্পূর্ণ করিয়া লইতে চাহিল !

সেই একটি রাত্রির পরিচয়েই চুণী বুঝিল, এই কর্ম্মিষ্ঠা

নারীটিকে লইয়া ঘর গৃহস্থালী চলিতে পারে, দেবসেবা অতিথি-সেবা চলিতে পারে, কিন্তু কবিতা চর্চ্চা চলিবে না! অবাধ, নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ সে ইহার কাছে পাইবে না।

তাহার এতদিনের কল্পিত আদর্শ চূর্ণ হইয়া গেল; চুনী হতাশ হইল!

২

বিন্দুর রূপ ছিল! কর্ম্মনিপুণা বলিয়া একটা খ্যাতি সে অতি অল্পদিনের মধ্যেই অর্জ্জন করিয়াছিল। রন্ধনে বিন্দু অন্নপূর্ণা সদৃশী; খোঁপা বাঁধিতে, টিপ কাটিতে, আলিপনা দিতে তাহার তুলনা নাই। গ্রামে কোনও বাড়ীতে ক্রিয়া কর্ম্মে উপস্থিত হইলে, গৃহস্থ আদর করিয়া বিন্দুকে রন্ধনের জন্য লইয়া যাইতেন!

পল্লীগ্রামে এ প্রথা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

নিমন্ত্রণ বাড়ীর রন্ধনশালায় অঞ্চল ঘুরাইয়া—কোমরে জড়াইয়া, বিন্দু যখন রন্ধনে ব্যস্ত থাকিত, তখন তাহার অর্দ্ধাবগুণ্ঠনাবৃত সুগৌর মুখখানির দিকে যে চাহিত, সেই ভাবিত, জননী অন্নপূর্ণা স্বয়ং বুঝি মলিন রন্ধনাগার আলো করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

বাঙ্গালার রন্ধনশালায় কর্ম্মরতা বাঙ্গালীবধূর মূর্ত্তি ক্রমেই বিরল হইয়া আসিতেছে! সেখানে উড়িষ্যাগত মুণ্ডিত-প্রায়-মস্তক শিখা তিলকধারী মূর্ত্তি বিশেষের আবির্ভাব হইতেছে!

বিন্দুর খ্যাতিতে গ্রাম ভরিল; কিন্তু খ্যাতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একজন তাহার উপর ক্রমেই বিরূপ হইতে লাগিল! সে একজন চুনী!

চুণী ভাবিত, সে বিন্দুর কাছে যাহা চাহে তাহা পায় নাই। বিন্দু বাহিরের দশটা কাজ নিয়া সময়ক্ষেপ করে এবং চুণীর কাছে ক্রমেই বিরল হইয়া উঠে, চুণী তাহা মোটেই পসন্দ করিতেছিল না। সে বিন্দুর নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ চাহিত; সংসারের দুটা কাজ বাহিরের দশটা কাজের ক্ষতি করিয়াও, বিন্দু যদি তাহার কাছে থাকে, চুণী তাহাতে লাভ ছাড়া লোকসান বলিয়া হিসাব করিত না! কিন্তু বিন্দু তাহা পারিত না!

চুণী যখন তাহাকে দিনের বেলায় কাছে ডাকিত, তখন সে একটু হাসিয়া অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে একটা অস্বীকারসূচক কটাক্ষ করিয়া সরিয়া যাইত! সুতরাং চেষ্টা করিয়াও চুণী বিন্দুকে দিনের বেলায় কাছে আনিতে পারিত না! রাত্রে বাড়ীর সকলে সুপ্তিমগ্ন হইলে বিন্দু অতি সন্তর্পণে যখন চুণীর ঘরে আসিত, তখন চুণী রোষে, ক্ষোভে শয্যায় চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত।

বিন্দু অভ্যাসমত একটা 'টিপয়' টানিয়া আনিয়া, তাহার উপর পানের ডিপাটা, গেলাসটা রাখিয়া কিছুক্ষণ নীরবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। তারপর মশারিটা ফেলিয়া প্রতিদিনের মতই স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া, আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া শুইয়া পড়িত! বিন্দু অচিরেই ঘুমাইয়া পড়িত, আর চুণী ক্রমেই রুষ্ট হইয়া উঠিত! যাহার উপর রাগ হয়, অভিমান হয়, সে যদি পাশে পড়িয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতে থাকে, তাহা হইলে রাগ ও অভিমানটা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে থাকে!

সে দিন বিন্দু রাত্রি প্রায় এগারটার সময় শুইতে আসিয়া দেখিল, চুণী যথারীতি বিছানায় পড়িয়া আছে; তাহার নিদ্রা যে কপট নিদ্রা, তাহা বুঝিল না। একবার ইচ্ছা হইল, ঘুম ভাঙ্গাইয়া দুটা কথা বলে; কিন্তু সাহস হইল না; নিদ্রিতের—বিশেষ নিদ্রিত গুরুজনের,—নিদ্রাভঙ্গ করা পাপ, সে তাহার ঠাকুরমার কাছে কতবার শুনিয়াছে; সুতরাং সে চুণীকে নিদ্রিত মনে করিলে কিছুতেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিত না! পান, জল প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিয়া, স্বামীর পায়ের কাছে একবার মাথাটি নীচু করিয়াই বিন্দু শুইয়া পড়িল। আজ সমস্ত দিনটাই বড় পরিশ্রম গিয়াছে, বিছানায় শুইবামাত্রই সে ঘুমাইয়া পড়িল!

চুণী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, একবার নিদ্রিতা বিন্দুর দিকে চাহিল। তারপর চেয়ারটা টানিয়া লইয়া টেবিলের কাছে বসিয়া পড়িল!

বিন্দুর এই প্রকার ব্যবহারের সে একটা সহজ অর্থ করিয়া লইয়াছিল; তাহার মনে হইত, বিন্দু তাহাকে উপেক্ষা করে,—বিন্দুর প্রেম হইতে সে বঞ্চিত। বিন্দু যদি তাহাকে উপেক্ষাই না করিবে, তাহা হইলে এমন ব্যবহার করে কেন?

চুণী অনেক কথাই ভাবিল; তাহার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, ঐ বিন্দুকে বিবাহ করিয়া তাহার জীবনের আশা, উদ্দেশ্য সমস্তই বিফল হইতে চলিয়াছে। তাহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে!

চুণী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যেই পাদচারণা

করিল ; একবার শয্যার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, নিশ্চিন্ত চিত্তে বিন্দু নিদ্রা যাইতেছে। মুখের উপর বিন্দু বিন্দু স্বেদ জন্মিয়াছে ; চূর্ণকুন্তল ক্বচিৎ স্বেদজড়িত হইয়া ললাটে লাগিয়া রহিয়াছে ! ছোট একটি সিন্দূরের টিপ্ সমস্ত মুখখানিকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে ! স্বপ্নাবেশে নিদ্রিতার মুখখানি একবার স্মিতহাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল ;—বড় সুন্দর মুখখানি—দেখিলে আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়,—মুখের অধিকারিণীকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয় !

গুরু নিঃশ্বাস পতনে পীবরবক্ষ ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল, চুণীর মনে হইতেছিল ঐ পরমশুভ্র বক্ষতটে মাথাটা রাখিতে পারিলে, বুঝি মাথার আগুন নিভিত, জ্বালা দূর হইত !

কৈশোরের, যৌবনারম্ভের সহস্র কল্পনা নিরর্থক হইয়াছে ;—কেন নিরর্থক হইল ? ঐ নারী কোথা হইতে আসিয়া পড়িয়া তাহার জীবনের চারিদিকে এই দারুণ ব্যর্থতা, এমনি করিয়া রচনা করিয়া তুলিল ?

কি ঐ নারী ? কি উহার শক্তি,—যাহার বলে সে তাহার শয্যাপার্শ্ব অধিকার করিয়া লইয়া পরম নিশ্চিন্ততার সহিত অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে ?

সে উহার কাছে কিছুই চাহিয়া পায় নাই :—অথচ উহাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইবারও কোনও উপায় নাই ! যাহাকে সে মুহূর্ত্তে মুষ্টির মধ্যে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে, তাহার কাছেই সে এমন করিয়া দীন ভিক্ষুকের মত কৃপা প্রার্থনা করে কেন ? চুণীর এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল, ঐ নিদ্রিতা নারীটিকে সবলে নাড়া

দিয়া, জাগাইয়া তুলিয়া জিজ্ঞাসা করে যে, সে কোন্ সাহসে তাহাকে এমন করিয়া উপেক্ষা করিতেছে ?

কিন্তু চুণী কিছুই করিতে না পারিয়া, নিজেই নিষ্ফল বেদনায় কাতর হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘরের মধ্যেই হাঁটিয়া বেড়াইল। তারপর একটা পাটী গৃহতলের উপরেই বিছাইয়া শুইয়া পড়িল !

যখন জাগিল তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে ! চুণী দেখিল, শয্যা ছাড়িয়া বিন্দু কখন উঠিয়া আসিয়াছে, এবং তাহারই কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে ! অবগুণ্ঠন সরিয়া গিয়াছে ; মুখখানি সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে, শিশুর মতই সরল বিশ্বাসপূর্ণ সুন্দর মুখ ! খোলা জানালার ফাঁক দিয়া পুষ্পগন্ধ বাতাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার চূর্ণকুন্তল উড়াইতেছিল ! প্রভাত সূর্য্যের কোমল রশ্মি তাহার তরুণ মুখখানির উপর লাগিয়া মুখখানিকে পরম সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল।

চুণী ধীরে ধীরে বিন্দুর কণ্ঠার্পিত বাহু পাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিন্দু ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিল ; কতবার বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল ; ঘুমের ঝোঁকে সে যে কখন শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছে, তাহা তাহার ভাল করিয়া মনে পড়িতেছিল না ! এতটা বেলা পর্য্যন্ত সে যে স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ঘুমাইয়াছে, তাহা মনে করিয়া সে নিতান্ত কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল ! বিপুল লজ্জায় তাহার নিদ্রাবেশ-সুন্দর মুখখানি রঞ্জিত হইয়া উঠিল ! সে চকিতভাবে একবার চুণীর মুখের

দিকে চাহিল, তার পর দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল !

চুণী কি বলিতে যাইতেছিল ; বিন্দু চলিয়া যাওয়াতে বাধা পাইয়া রুষ্ট হইয়া উঠিল, এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই পাটীটার উপরেই বসিয়া থাকিয়া, খোলা জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল !

৩

চুণী বুঝিল, ঠিক এ ভাবে দিন কাটিবে না ! কিছু দীর্ঘকাল দূরে থাকিলে হয়ত বিন্দুর পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এবং বিন্দুর উপর যে অভিমানটা তাহার অন্তর মধ্যে নিশিদিন সজাগ হইয়াই রহিয়াছে, সেটাও একটু চাপা পড়িতে পারে। সুতরাং খবরের কাগজের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া সে প্রত্যহই 'কর্ম্মখালির' সংবাদ লইতে লাগিল এবং প্রতি সপ্তাহেই চারি পাঁচ খানি আবেদন পত্র লিখিয়া ডাকে দিতে লাগিল।

প্রায় দুই মাস পরে তাহার একটি কর্ম্ম জুটিল !

একটা ছোট সহরে, একটা ইংরাজি স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, চুণী যে দিন চলিয়া গেল, সে দিন বর্ষণক্লান্ত মেঘের কোলে ঘটা করিয়া বিজলী চমকিতেছিল ; নিবিড় অন্ধকার ধরণীর পৃষ্ঠকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল ; কোনও বাধা না মানিয়া চুণী চলিয়া গেল !

শয়নকক্ষ হইতে বাক্সটা বাহির করিয়া দিবার সময় বিন্দু সেখানে ম্লানমুখে দাঁড়াইয়াছিল। সমস্ত দিনটাই সে শ্বশ্রূর আদেশানুসারে চুণীর জন্য নানাপ্রকার খাদ্য তৈয়ারী করিতে ব্যাপৃত ছিল।

একবারও একটুকু অবসর করিয়া লইতে পারে নাই, যে চুণীর সঙ্গে দেখা করিবে!

কিন্তু চুণী তাহা বুঝিল না; সে বিপরীত অর্থই করিল! দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া, মনে মনে কহিল, "শুধু কাজের মিথ্যা অছিলায়, তুমি নিশিদিনই আপনাকে দূরে রাখিতে চাহিয়াছ,—আচ্ছা, সেই কাজ লইয়াই থাক! নিশিদিন অবাধে কাজ করিতেই থাক, আর কেহ তোমার জন্য লুব্ধ আশ্বাসে বসিয়া থাকিবে না!—"

বাক্স ধরিয়া টানিয়া আনিতে আনিতে, চুণী একবার বিন্দুর মুখের দিকে চাহিল;—দেখিল, মুখখানি বড় ম্লান, বিন্দু তাহার ব্যথিত দৃষ্টি চুণীর মুখের উপরেই নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল,—চুণী চাহিতেই একটু চমকিয়া উঠিয়া সে চক্ষু নত করিল। একটা দ্রুত শোণিতোচ্ছ্বাস মুখখানিকে মুহূর্ত্তের জন্য রঞ্জিত করিয়া তুলিল! চুণীর একবার ইচ্ছা হইতেছিল, বিন্দুকে ডাকিয়া দু'টা কথা বলে, কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল, যে, আজিকার সমস্ত আয়োজনই ত বিন্দুকে আঘাত করিবার জন্য;—সুতরাং তাহাকে ডাকিয়া দু'টা কথা বলিয়া এই আয়োজনটাকে কোনও মতেই ব্যর্থ করা চলে না।

চুণী চলিয়া গেল;—বিন্দুর সহিত একবারটি দেখা না করিয়াই, তাহাকে ডাকিয়া দু'টা কথা না বলিয়াই, চুণী চলিয়া গেল!

গাড়ীতে উঠিয়া সে যখন জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিয়া বসিয়া পড়িল, তখন প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে! রাত্রির ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া বাষ্পীয় শকট বিপুলকায় দৈত্যের মতই ছুটিয়া

চলিয়াছে ; মধ্যে মধ্যে এক একটা ষ্টেশনে আসিয়া থামিতেছে ! ষ্টেশনের কোলাহল, ব্যস্ততা, আলোক, পশ্চাতে রাখিয়া মুহূর্ত্ত পরেই গাড়ী আবার দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে !

চুণীর কোন দিকেই লক্ষ্য নাই ; রুদ্ধ জানালার কাঁচের উপর প্রবলবেগে জলের ঝাপ্‌টা আসিয়া লাগিতেছিল, সে সেই দিকেই শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে ! এখন তাহার মনে হইতেছিল, বুঝি বিন্দুকে ডাকিয়া দু'টা কথা বলিয়া আসিলেই ভাল হইত ! তাহাতে আর কিছু না হউক অন্ততঃ তাহার নিজের পক্ষ হইতে কর্ত্তব্যের কোনও ত্রুটি হইত না ! একবার মনে হইল, বিন্দু ত তেমন কিছু অপরাধ করে নাই, যে জন্য সে তাহাকে এমন কঠিনভাবে শাস্তি প্রদান করিতে পারে ! তখনই মনে হইল, তাহার সঙ্গ হইতে বিমুক্ত হওয়া, বিন্দুর পক্ষে এমন কিছু কষ্টকর নহে ;—সে যখন কাছে ছিল তখনও ত বিন্দু তাহার সঙ্গ চাহে নাই ! বিন্দুর অভি-মুখে সে তাহার উপেক্ষিত প্রেমকে প্রেরণ করিতে যাইয়া চির-দিনই আঘাত পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে ! সে ত একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গও বিন্দুর হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই।—সে বিন্দুকে শুধু দিয়াছেই,—কিন্তু প্রতিদানে কি পাইয়াছে ? কিছুই ত পায় নাই। তাহার বিবাহিত জীবনের সুদীর্ঘ তিনটি বৎসর ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে ! কে এই ব্যর্থতা অতি সন্তর্পণে গড়িয়া তুলিয়াছে ? —সে ঐ বিন্দু ! ঐ বিন্দু !

তুচ্ছ নারী,—কি তাহার ক্ষমতা ?

চুণীর হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনা, উপেক্ষা, অপমান উগ্র হইয়া উঠিয়া হলাহল উদ্গীরণ করিল! যে নারী তাহার জীবনের পথের উপর আসিয়া পড়িয়া এমন করিয়া তাহার সমগ্র কল্পনাকে ব্যর্থ করিয়াছে, কবিত্বের উৎসমুখকে শুকাইয়া তুলিয়াছে, সমস্ত জীবনটার মধ্যে রসশূন্য মরু রচনা করিয়াছে, তাহাকে দিয়া সে কি করিবে? সে তাহার গমনপথের উপরেই একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধার মতই, পাষাণ মূর্ত্তিতে অটল, অচল, হইয়া বসিয়া রহিয়াছে,—তাহাকে টানিয়া তুলিয়া সরাইয়া দেওয়া যায় না কেন? বিন্দু ত কোনও দিনই সরিয়া যাইতে আপত্তি করে নাই, সে যখনই তাহাকে রূঢ়ভাবে ব্যথা দিতে চাহিয়াছে, তখনই তাহার সুগৌর মুখখানি নিতান্ত অসহায় ভাবে বেদনায় ম্লান হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু পরক্ষণেই চুণী দেখিয়াছে, সে আঘাত যেন তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই; বিন্দু সহস্র কার্য্যের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ম্লানিমাটুকু নিঃশেষ করিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে!

বিস্মিত, রুষ্ট চুণী মনে করিয়াছে, এ প্রাণহীন, বোধহীন পাষাণপ্রতিমা; কোন বেদনা, কোনও আঘাতেই ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না!

চুণী ভাবিয়াছিল, যে আঘাত পাইলে কাঁদে না, তাহাকে লইয়া মানুষের দিন কাটে না! যে সহস্র বেদনা পাইয়াও নীরব থাকে, প্রাণ আছে বলিয়া সাড়া দেয় না, সে পাষাণপ্রতিমা! সে পাষাণপ্রতিমাকে বুকে করিয়া দিন কাটান যায় না! সুতরাং তাহার গৃহকোণটিতেই পাষাণপ্রতিমাখানিকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া

আসিল! এবং বিশ্বের কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া পাষাণী বিন্দুকে ভুলিতে চাহিল।

৪

কিন্তু যাহাকে ভুলিবার জন্য চুণী চলিয়া গেল, সেই বিন্দুর মুখের হাসি এবার সত্যই নিভিল! এতদিন পরে আজই বিন্দুর মনে হইল, সত্যই বুঝি স্বামী তাহার প্রতি বিরূপ!—একথাটা এতদিন তাহার একবার ঘুণাক্ষরেও মনে হয় নাই। স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিবে, ইহাই স্বাভাবিক, ইহার মধ্যে যে একটা চাহিয়া নেওয়া, বা সাধিয়া দেওয়ার অপেক্ষা থাকিতে পারে, বিন্দু তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই! আজ তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সে তাহার স্বামীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত,—সে তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও সুখী করিতে পারে নাই। সুখী করিতে পারে নাই বলিয়াই ত তিনি চলিয়া গেলেন!

বিন্দুর মনে হইতেছিল, সমস্ত অপরাধই তাহার; যে নারী স্বামীকে সুখী করিতে পারে না, সে বাঁচিয়া থাকে কেন? তাহার ব্যর্থ নারীজীবনেই ধিক্! চুণীর কোনও অপরাধ থাকিতে পারে, একথা তাহার একবারটি মনেও উঠিল না! বিন্দু ভাবিল, সে কুমারকান্তি সর্ব্বগুণসম্পন্ন স্বামী পাইয়াছিল,—কয়জন নারী তেমন পাইয়া থাকে? বড় গর্ব্বে তার বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার সে গর্ব্বে আঘাত লাগিয়াছে! সে যেমন পাইয়াছিল, এমন কয়জন পায়? স্বামী তাহার প্রতি বিরূপ হইলেন,—কেন? দোষ কাহার?

বিন্দু ভাবিল, সে বুদ্ধির দোষে সব হারাইয়া আজ কাঙ্গালিনী হইতে বসিয়াছে! দোষ তাহারই সত্য, কিন্তু সে যে কি অপরাধ করিয়াছে, তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না! স্বামীকে দেবতারও উপরে আসন দিয়া সে পূজা করে, তবু এমনটা হইল কেন? বিন্দু অনেক ভাবিল, কিন্তু কোন মতেই স্থির করিতে পারিল না, কোথায় তাহার অপরাধ! তখন বিন্দু বড় কাঁদিল! নিজের নির্জ্জন ঘরটিতে মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িয়া বড় কাঁদিল!

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া সে উঠিয়া বসিল; জানালার ফাঁক দিয়া প্রাঙ্গণের মুকুলিত অম্রবৃক্ষশীর্ষের দিকেই শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল!

এমন সময়ে কে যেন পশ্চাৎ হইতে মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "বৌ,"—

বিন্দু চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল এবং মাথার অবগুণ্ঠন একটু টানিয়া ঠিক্ করিয়া দিল!

"কি, কথা কচ্ছিস্ না যে?" তারপর ভাল করিয়া বিন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "ও কি লো, তুই যে কাঁদ্‌ছিলি, বৌ?"—

যে আসিয়াছিল, তাহার নাম ষোড়শী; কিন্তু বয়স ষোড়শের কিছু ঊর্দ্ধে; বোধ হয় সপ্তদশ হইবে। সুন্দর মুখখানি সর্ব্বদাই হাস্যরঞ্জিত, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল! চুলগুলি সযত্নবিন্যস্ত নহে—অংসে উরসে, ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

তাহাকে দেখিলে মনে হয়, স্বামীর সোহাগস্পর্শে তাহার সৌন্দর্য্যের উপর দিয়া একটা অকুণ্ঠিত তৃপ্তির গৌরব ফুটিয়া উঠিয়াছে! সে যেন সোহাগ ও আদরের প্রাচুর্য্যে একেবারে ভাদ্রের নদীটির মতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে!

প্রশ্ন শুনিয়া বিন্দু তাড়াতাড়ি কহিল, "না ঠাকুরঝি, কাঁদ্‌ব কেন ?" কিন্তু কথা কহিতে তাহার চক্ষু আবার অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল !

ষোড়শী কাছে আসিয়া দুই হাতে বিন্দুর মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "বা—রে ! কাঁদ্‌ছিস, আবার বল্‌ছিস্‌, কাঁদ্‌ব কেন !"—

"কই কাঁদ্‌ছি,—ও চ'খে কিছু গিয়েছে বুঝি !"—গাঢ়স্বরে বিন্দু কহিল !

মুখ ভার করিয়া ষোড়শী কহিল, "তা বল্‌বিনি বল্‌লেই পারিস্‌ ! আমি ত আর তোর আপনার জন কেউ নই, যে বল্‌বি ! অন্য বাড়ীর একজন—সে ত স্নেহের দাবী ছাড়া আর কিছুরই দাবী করিতে পারে না ।"

বিন্দু তাহার অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি ষোড়শীর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল, "কি যে বলিস্‌ ঠাকুরঝি ! তুই যদি আমার আপনার জন নস্‌, তবে আমার আপনার বল্‌তে আর কে আছে, লক্ষ্মী ?"—কথাগুলির মধ্যে একটা গভীর বেদনার সুর ছিল, যাহা ষোড়শীকে ব্যথিত করিয়া তুলিল !

সে ভূন্যস্ত-জানু হইয়া বসিয়া পড়িয়া, সাদরে দুই হাতে বিন্দুর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল, এবং ঠোঁটে তাহার রক্তকপোল প্রায় স্পর্শ করিয়া কহিল, "না বিন্দু, আমি কিছু মনে ক'রে বলিনি ; ও কেবল তোর কাছ থেকে কথা বের ক'রে নেবার জন্যই একটু আঘাত দিতে যেয়ে বোকামী ক'রে ফেলেছি ; জানিস্‌ইত, বোঠান্‌, আমার বুদ্ধিটা একটু কম,"—বিন্দু একবার মৃদু হাসিল !

তাহার চোখে জল, মুখে হাসি দেখিয়া ষোড়শী একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিল। বিন্দু কহিল, "তোর যে বুদ্ধি কম, তা' আমরা জানি,—কিন্তু তুই জানিলি কেমন ক'রে?—তোকে কেউ বলেছে নাকি রে?"

বিন্দুর কথার গতি নিজের নিকট হইতে ষোড়শীর দিকে ফিরাইয়া নিতে চাহিতেছিল। কারণ, আজ সে ষোড়শীর কাছে ধরা পড়িয়াছে; ষোড়শী যদি বেশী চাপাচাপি করে, হয়ত অনেক কথাই তাহাকে বলিয়া ফেলিতে হইবে!

ষোড়শী কহিল, "কেউ আবার বল্‌বে কি? ও আমি নিজেই টের পেয়েছি!"—

"কেন শিশির বাবু বলেন নাই, কিছু?"

চক্ষু ঘুরাইয়া ষোড়শী উত্তর দিল, "ইঃ—পুরুষগুলো তাদের নিজেদের বুদ্ধির হিসাব নিয়েই ব্যস্ত, তারা পরের বুদ্ধির খপর রাখবার অবসর পায় না! মেয়েগুলিকে ত 'অবলা সরলা' বলেই আমল দিতে চায় না,—তারা কি আমাদের বুদ্ধির খপর রাখে? দেখিস্ না, এক একটা দিগ্‌গজ পুরুষ, তাদের 'দাপটে' পৃথিবীশুদ্ধ লোক অস্থির, ফণা তুলে সবাইকে তেড়ে যায়, কিন্তু অন্দরে ঢুকে, যেম্‌নি এতটুকু একটা মেয়ের সামনে পড়েন, অমনি একেবারে কেঁচোটি বনে যান্—"

বিন্দু মৃদু হাসিয়া কহিল, "তা তুই বুঝি, শিশির বাবুকে 'কেঁচোটি' করেই রেখেছিস্—"

চক্ষু টিপিয়া ষোড়শী কহিল, "দূর তা কেন?—আমি কি ক'রে

রেখেছি ?—ওটা পুরুষজাতের স্বভাব ব'লে ওরা নিজে থেকেই হ'য়ে পড়ে,"—একটা দুষ্টামির হাসিতে ষোড়শীর সমস্ত মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল !

বিন্দু একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "তা' কি জানি,—তুই যা বুঝিস্ ! তবে ও জাতটাকে যে অত সহজে আঁচলে বেঁধে রাখা যায়, এ ত আমার মনে হয় না, ঠাকুরঝি !"

ষোড়শী বিন্দুর মুখের ম্লান হাসি দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া একটু সন্দেহের স্বরে কহিল, "তা' সে কথা যা'ক্ ; এসে তোর চ'খে জল দেখ্‌লাম কেন, সেইটে ভাঙ্গিয়ে বল্‌ত লক্ষ্মীটি ! তোর হাসি ছাড়া, চোখের জল ত কোন দিনই দেখিনি ! কি হয়েছে ?" ষোড়শী বাম বাহুতে বিন্দুর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিয়া দক্ষিণহস্তে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিল !

বিন্দু বিপদে পড়িল ; তাহার কথা যে কাহাকেও বলিবার নহে ! কেন এমনটা হইল, সে যখন নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না, তখন অন্যকে বুঝাইবে কি করিয়া ?

বিন্দুর কুণ্ঠা দেখিয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ষোড়শী ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, "দাদার চিঠি পেয়েছিস্ বৌ ?"

বিন্দু সসঙ্কোচে, অতি মৃদুকণ্ঠে কহিল, "না ।"

"কত দিন পাস্‌নি ?"

এবার বিন্দু কথা কহিল না ; চক্ষু নত করিয়া মাটির দিকে চাহিল ; এবং ষোড়শীর ভূলুণ্ঠিত অঞ্চলপ্রান্ত তুলিয়া লইয়া তাহার একটা খুঁট অন্যমনস্ক ভাবে আঙ্গুলে জড়াইতে লাগিল !

সে যে চুণীর কাছ হইতে একটি ছত্র লেখাও পায় নাই, সে কথা সে ষোড়শীকে কেমন করিয়া বলিবে? সে যে অন্তরে অন্তরে কতখানি দীন, রিক্ত, কাঙ্গাল, তাহা সে কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে?

কিন্তু এই প্রশ্নগুলি হইতে আত্মরক্ষা করাও দরকার হইয়া পড়িতেছিল; তাই সে ধীরে ধীরে কহিল, "তুই শিশির বাবুর চিঠি পেয়েছিস্?" ব্যাপারটা বুঝিতে ষোড়শীর বাকী রহিল না। বিন্দুর অন্তরে একটা নির্দ্দিষ্ট বেদনা পীড়িত স্থানের কাছাকাছিই যাইয়া যে সে আঘাত করিয়াছে, ষোড়শী তাহা বুঝিল। বুঝিয়া ব্যথিতা হইল। ষোড়শী স্থির করিল, ইহার একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্ভব হইলে,,প্রাণপণ চেষ্টায় তাহা করিতেই হইবে! তখন ষোড়শী বিন্দুর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "নে, তোর চালাকি রাখ্; আমি বোকা হ'লেও তোর চেয়ে বুদ্ধি কম রাখি না; যা বলি ঠিক ঠিক উত্তর দে দেখি,—না হ'লে—" উপায়ান্তর না দেখিয়া বিন্দু কাতরভাবে কহিল,—"ঠাকুরঝি, আমার মাথা খা'স্, কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিস্‌নে,——"

"তোর চুল সমেত অত বড় মাথাটা খাওয়ার অবসর আমার মোটেই নাই।—কতদিন দাদার চিঠি পাস্‌নি?"

বিন্দু কথা কহিল না; তাহার কপোলে, ললাটে স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; নিতান্ত অসহায়ার মতনই নীরবে মাটির দিকে সে চাহিয়া রহিল!

"মোটেই চিঠি লেখে নি বুঝি?"

বিন্দু কাতরদৃষ্টিতে একবার ষোড়শীর মুখের দিকে চাহিয়া, আবার মাথা নীচু করিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, "মোটেই লিখ্‌বেন না কেন? মার কাছে মধ্যে মধ্যে চিঠি আসে ত? তা'তেই সংবাদ জান্‌তে পাই,—— "

"মার কাছে আসে, তবে আর কি! তা তোর কাছে লেখে না কেন?"

"কি ক'রে বল্‌ব ঠাকুরঝি! দরকার হ'লে অবিশ্যি লিখতেন,—"

ষোড়শী এবার রাগিয়া গেল, কহিল, "ওমা কথার শ্রী দেখ! খুকিটি আর কি! বলি, তুই লিখিস্ ত?"

ছোট একটি কথা কোনও মতে অস্ফুট ভাবে বিন্দুর মুখ দিয়া বাহির হইল, "না!"

বিস্মিতকণ্ঠে ষোড়শী কহিল, "সে কি লো! কেন, তোদের ঝগড়া হয়েছে নাকি?"

"জানি না।"

"জানিস্‌নে কিরে! তিনি যখন গেলেন, তখন কি বলে গেলেন তোকে?"

কেহ যেন বিন্দুর শ্বাসনালী চাপিয়া ধরিতেছিল, সে রুদ্ধস্বরে কহিল, "কিছুই না,—" তারপর তাড়াতাড়ি উঠিতে উঠিতে কহিল, "ইঃ, বেলাটা একেবারেই গেছে যে, কত কাজ রয়েছে,—ঠাকুরঝি, একটু বস্‌না, ভাই প্রদীপের সল্‌তে পাকাতে হ'বে, আমি একটু ন্যাক্‌ড়া—"

ঠাকুরঝি কিন্তু তাহাকে ছাড়িল না, টানিয়া বসাইয়া দিতে দিতে কহিল, "সল্‌তে পাকাবি কিরে? বেড়ার গায়ে যে সল্‌তে জমেছে, ওতে যে ছ'বচ্ছর যেতে পারে! ও সব ফাঁকি চল্‌বে না!—একটা কিছু বিশ্রী যে ঘটেছে তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। সব ভেঙ্গে বল্, লক্ষীটি, যত দূর সম্ভব প্রতীকার আমি কর্‌বই! সত্যি বৌঠান, তোর চ'খে জল দেখে আমার মনটা বড় অস্থির হ'য়ে উঠেছে!"

ষোড়শীর হাত ছাড়াইতে না পারিয়া বিন্দু হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। এই সহানুভূতির স্পর্শে, তাহার বুকের ভিতর যে আকুল বেদনাস্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল! তাহার চক্ষু ছাপিয়া অশ্রু ফুটিয়া উঠিল; অশ্রুজড়িত মৃদু কণ্ঠে সে কহিল, "ঠাকুরঝি, আমি তাঁর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত,—কেমন ক'রে তাঁর উপযুক্ত হ'তে পার্‌ব, আমি ভেবেই পাই না! মনে হয় সবই আমার অপরাধ,—নইলে এমন হবে কেন? ক'জনে এমন স্বামী পায়?—আমি পেয়েও হারা'তে বসেছি, সে আমারই দোষে। আমি বোকা, কেমন ক'রে স্বামীকে সুখী করতে হয় জানি না, তাই এমন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠে, তিনি চাক্‌রী নিয়ে চলে গেলেন। এর চেয়ে আমার মরাও ভাল ছিল যে!"—বিন্দু ষোড়শীর স্কন্ধের উপর মুখ রক্ষা করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ষোড়শী বাধা দিল না। তীব্র দুঃখের আবেগকে অশ্রুরূপে গলিয়া বাহির হইতে দিলে যে বুকটা কতক হাল্‌কা হয় ষোড়শী তাহা জানিত।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ষোড়শী ডাকিল,—"বোঠান্"—

—"কি ঠাকুরঝি ?"

—"তোর কোনও দোষ থাকতে পারে, তা' আমি মনেও করতে পারিনা। দাদাকে "কাব্যি" রোগে ধরেছে, তা' আমি বেশ বুঝতে পারচি! দিন কয়েক 'হা হুতাশ' ক'রে বাইরের ধুলো খেয়ে যখন ঘরে ফিরবেন, তখন ও সব রোগ সেরে যাবে। কিন্তু তার আগে তুই দাদার কাছে, আমি যেমনটি বলি ঠিক্ তেমনই ক'রে, একখানা চিঠি লেখ দেখি' !"—

বিন্দু বিস্মিত ভাবে ষোড়শীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "চিঠি !—আমি লিখিব !"—

"তবে কে লিখবে ? তোর কথা শুনলে আমার পিত্তিশুদ্ধ জ্বলে যায় !"—

—"না, সে আমি পারব না, ঠাকুরঝি !"—

—"কেন পারবি না ?"—

"তিনি যে অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত রেখেছেন, সে অধিকার আমি জোর ক'রে নিতে যাব কোন্ ক্ষমতায় ?"—

"কেন তা'তে অপমান হ'বে নাকি ?"—কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই ষোড়শী বুঝিল, এমন একটা কথা বলা ভাল হয় নাই! বিন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, মুখের উপর একটা বেদনার ছায়া নিবিড় হইয়া আসিয়াছে।

বিন্দু কাতরভাবে কহিল, "তাঁর কাছে আমার মান অপমান

কি ঠাকুরঝি ? কিন্তু যিনি মান রাখ্‌বেন,—তিনি যদি মান না রাখ্‌লেন, অধিকার না দিলেন, সেধে অপমানটাকেও সঙ্গে সঙ্গে ডেকে আন্‌ব কেন ?"

বিন্দুর কথা শুনিয়া ষোড়শী মনে মনে তাহার প্রশংসা করিল। কিন্তু তাহার চোখে জল আসিতেছিল। সে চুপ করিয়া একটু ভাবিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, "তা, যেদিন তোকে এ ঘরে বরণ ক'রে আনা হয়েছে, সেই দিনই ত তুই সব অধিকার পেয়েছিস্ !"—

বিন্দু তাহার অশ্রুপূর্ণ দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ষোড়শীর মুখের উপর স্থাপন করিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল, কহিল, "তা' কি সব সময়ে পাওয়া যায়, ঠাকুরঝি ? এই শ্বশুরের ভিটে পুড়ে ছাই হ'লেও কেহ আমাকে এখান থেকে দূর করতে পার্‌বে না, সে অধিকার সত্যি আমি পেয়েছি ; কিন্তু আমার ছাইয়ের উপর যদি কেউ জল না ঢালে,—তবে আমি জোর ক'রে ঢালা'তে পারি, সে অধিকার পেয়েছি বলে ত মনে কর্‌তে পারি না ! যদি একবারও কেউ সে অধিকার দিয়ে তার পর ফিরিয়ে নিত, তা' হ'লেও না হয় দাবী কর্‌তে পার্‌তাম। কিন্তু দাবী যে কর্‌ব কিসের জোরে, তা'ত ঠিক বুঝ্‌তে পারি না, ঠাকুরঝি !"

বিন্দু চুপ করিল। বিন্দুর মুখে এত কথা শুনিয়া ষোড়শী বিস্মিত হইল ! ভিতরে ভিতরে যে এমন একটা প্রলয়ঙ্কর মেঘ সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, ষোড়শী তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিত না। সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া একটা গভীর

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল ; তার পর ধীরে ধীরে কহিল, "তা' হ'লে তুই চিঠি লিখ্‌বি না ?"—বিন্দুর মুখে শুধু একটি ম্লান হাসিই দেখা গেল। সে কোনও কথা কহিল না !

ষোড়শী উঠিয়া কহিল, "তবে আমি আজকার মত উঠ্‌লাম, দেখি যদি কিছু উপায় থাকে !—"

বিন্দু ষোড়শীর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দুয়ার পর্য্যন্ত আসিল ; হঠাৎ ষোড়শীর দুই হাত টানিয়া আনিয়া নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। তারপর গাঢ়স্বরে কহিল, "ঠাকুরঝি !"—

ষোড়শী বিন্দুর অশ্রুসজল ম্লান মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিল, "বুঝেছি, বোঠান, কিছু বল্‌তে হবে না ; আমি কারু কাছে কিছু বল্‌ব না"—মনে মনে ভাবিল, 'শুধু একজনের কাছে ছাড়া !'

—"এখন ছাড়্‌ বিন্দু,—সন্ধ্যে হয়ে এল।"

ষোড়শী চলিয়া গেল। বিন্দু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিল।

৫

দৈব বুঝি বিন্দুর প্রতিকূল ছিল !

বৎসর ঘুরিয়া গেল, কিন্তু চুণী বাড়ী আসিল না। পূজার ছুটিতে ছেলে বাড়ী আসিল না, মাতাকে বুঝাইল, নূতন চাকুরী, আসিলে ক্ষতি হইতে পারে। বৃদ্ধা সেকালের মানুষ, ছেলে যাহা বুঝাইল, তাহাই বুঝিলেন। বিজয়ার দিন সকলের আগে চুণী আসিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলি গ্রহণ করিত, এবার চুণী

আসিল না। পাড়ার, গ্রামের সকলে আসিয়া একে একে প্রণাম করিয়া গেল; বৃদ্ধার বুকের মধ্যে একটা গুরু নিঃশ্বাস থাকিয়া থাকিয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল; তিনি ঠাকুর ঘরের দুয়ারে বসিয়া মালা জপ করিতে করিতে সেই নিঃশ্বাসটাকে ফিরাইয়া দিতে চাহিলেন, বৎসরকার এই বিশেষ দিনটিতে অমন করিয়া একটা নিঃশ্বাস বাহির হইলে, ছেলের অমঙ্গল হইতে পারে। তাই তিনি স্থির করিয়াছিলেন, কোনও মতেই দীর্ঘনিঃশ্বাসটাকেও বাহির হইতে দিবেন না, চক্ষু দুইটাতেও অশ্রু সঞ্চিত হইতে দিবেন না।

তারপর বড়দিনের ছুটি গেল, গ্রীষ্মের ছুটিও আসিল; কিন্তু চুণী আসিল না। চুণীর চিঠিপত্র লেখাও বিরল হইয়া আসিল।

তখন বৃদ্ধা শয্যাগ্রহণ করিলেন। মাঝে মাঝে উঠিয়া যাইয়া ঠাকুর ঘরের দুয়ারে বসিতেন, জপের মালা হাতে থাকিত, কিন্তু দৃষ্টি পথের দিকেই নিবদ্ধ থাকিত। ছেলের অমঙ্গল আশঙ্কায় আগে চোখে জল আসিতে দিতেন না, এখন চোখের জলে আর ভাল করিয়া ইষ্টকবচও দেখিতে পাইতেন না! পাছে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে, ভয়ে তাই দুই হাতে যখন তখন বুকটা চাপিয়া ধরিতেন, এখন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বক্ষপঞ্জর ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

এ গ্রীষ্মের ছুটিও কাটিয়া গেল। আবার পূজার ছুটি আসিল। চুণীর কোনও সংবাদ তিন মাসের মধ্যে আসে না। পাড়ার একটা ছেলেকে ধরিয়া বৃদ্ধা চুণীর কাছে চিঠি লিখাইলেন, উত্তর ত আসিলই না; কিছুদিন পরে চিঠিখানি বৈরাগী ঠাকুরের মত

সর্ব্বাঙ্গে ছাপ কাটিয়া, "ডেড্ লেটার আফিস" হইতে ফেরত আসিল !

বৃদ্ধা সেদিন শয্যাত্যাগ করিয়া আর ঠাকুর ঘরের দুয়ারে যাইয়া বসিতে পারিলেন না !

বিন্দু আসিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "মা"——বৃদ্ধা চক্ষু তুলিয়া বধূর মুখের দিকে চাহিলেন। বিন্দু দেখিল চক্ষু দুইটা লাল হইয়াছে, একটু স্ফীতও হইয়াছে। বিন্দু ভূনতজানু হইয়া শয্যার কাছে বসিয়া পড়িয়া শ্বশ্রূর পায়ে হাত দিল। বিন্দুর হাত টানিয়া লইয়া বৃদ্ধা নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন। বিন্দু দেখিল, জ্বরে গা' পুড়িয়া যাইতেছে !

"এমন জ্বর হয়েছে মা তোমার, কই, কিছু বলনি তো আমাকে !"—

বৃদ্ধার মুখে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে কহিলেন, "তোর হাতখানা আমার বুকের উপর রাখ্, বৌমা ! মনে হয় যেন বুকের ভিতরটা জ্বলে গিয়েছে"—

বিন্দু কথা কহিল না ; অবগুণ্ঠনের পাশটা একটু টানিয়া দিল, চোখে জল আসিতেছিল, শ্বশ্রূ না দেখিতে পান ! ধীরে ধীরে বুকে হাত বুলাইতে লাগিল, একটু সামলাইয়া লইয়া কহিল, "আজ আর অতক্ষণ বসে পূজা ক'রোনা মা, সংক্ষেপে অঞ্জলিটা দিয়ে রেখো !"

"মা তোর মুখখানি দেখ্তে পাচ্ছিনে, মাথার কাপড়টা একটু সরিয়ে নে"—

উপায়ান্তর না দেখিয়া বিন্দু অবগুণ্ঠনটা সরাইবার সময়েই কোনও মতে একবার চক্ষু দুইটা মুছিয়া ফেলিল। বৃদ্ধা তাহা লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তারপর আবার বিন্দুর দিকে ফিরিলেন। বিন্দু নীরবে তাঁহার বুকে পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল!

"ও বাড়ীর ষোড়শীর আস্‌বার কথা ছিল, সে কি এসেছে ?"—

"না মা, আসেনি, বোধ হয় সপ্তমীর দিন আস্‌বে!"—

"সে তোর কাছে চিঠি লিখেছে ?"—

"কাল তার চিঠি পেয়েছি"—

"শিশির কোনও খোঁজ নিতে পেরেছে ?"—

শিশিরকে চুনীর খোঁজ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া বিন্দু ষোড়শীকে চিঠি দিয়াছিল। ষোড়শী উত্তর দিয়াছে, শিশির চুনীর খোঁজ পায় নাই। বৃদ্ধা রুদ্ধনিঃশ্বাসে বধূর মুখের দিকে চাহিলেন। উত্তরটা বিন্দুর গলায় যেন বাধিয়া আসিতেছিল; বিন্দু চক্ষু নত করিল, আবার চোখে জল আসিতেছিল।

"—তবে খোঁজ পায়নি বুঝি ?"—

বিন্দু কহিল, "মা তুমি অত অস্থির হ'লে চল্‌বে কেন, মা ? সংবাদ পাওয়া যাবেই!"

শ্বশ্রূকে প্রবোধ দিতে যাইয়া বিন্দুর নিজেরই নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। সে মুখ ফিরাইয়া, দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কান্নাটাকে রোধ করিতে চাহিল।

বৃদ্ধা দুই হাতে বধূর কোমল স্বেদসিক্ত হাতখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুজড়িতকণ্ঠে কহিলেন, "সে যে তোর মুখের দিকে চাইল না, তোকে চিন্‌তে পার্‌ল না, এইটেই মা, আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ, এ দুঃখ আমার বুঝি মলেও যাবে না!"—

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কহিলেন, "সে যে কিসের মোহে বাড়ী ঘর ভুলেছে, তোকেও ভুলেছে, তা' আমি ভেবেও পাই না! এ যে কত বড় অপরাধ তা' আমি মনে কর্‌তেও শিউরে উঠি!"—

বিন্দু অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমি কোন ছার, মা; তোমাকে ভোলাই যে সব চেয়ে বড় অপরাধ;—সে অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেবার অবসরও বুঝি তুমি দেবে না, মা;—যে তোমার শরীর হয়েছে, আমি যে এ আর চোখেও দেখ্‌তে পারিনে মা!—"

"আমার কাছে তার ক্ষমা চাওয়ার দরকার হবে না,—সময়ও হবে না, মা! আমি তাকে ক্ষমা করেই যাচ্ছি, আর তার কোনো অপরাধই তো অপরাধ বলে মনে কর্ত্তে পারিনে, মা! কি জানি, আমি অপরাধ বলে একবারটি মনে কর্লেও যদি তার কোন অমঙ্গল হয়; জোর করে নিঃশ্বাসটাও যে আমি ফেল্‌তে চাইনে, বিন্দু! এ যে কি জ্বালা তা'তো বলে বুঝান যায় না, মা! কিন্তু তোর কাছে সে যে অপরাধ করেছে, তার জন্য তুই যদি তাকে ক্ষমা কর্ত্তে না পারিস্, তা' হলে সেটা তার যে কতখানি দুর্ভাগ্য, তা আমি তো বলেও শেষ কর্ত্তে পারিনে!"—

একটা গভীর কাতরোক্তি করিয়া বৃদ্ধা নীরব হইলেন!

বিন্দু এ কথার যে কি উত্তর দিবে তাহা বুঝিতে পারিল না। সে তো চিরদিন নিজের অপরাধই অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছে, কোনও দিনই তো একটিবারের জন্যও মনে করে নাই, যে স্বামীর বিন্দুমাত্র অপরাধও এ ব্যাপারে থাকিতে পারে।

তিন দিন পরে সন্ধ্যার বিরলান্ধকারের মধ্যে প্রাঙ্গণে শায়িত শ্বশ্রূর মৃতদেহের পার্শ্বে পড়িয়া যখন বিন্দু লুণ্ঠিত হইতেছিল, তখন কেহ আসিয়া বাষ্পজড়িত মৃদুস্বরে ডাকিল, "বোঠান্, বিন্দু"—

বিন্দু চক্ষু চাহিয়া দেখিল, ষোড়শী আসিয়াছে। ষোড়শী বিন্দুর কাছে বসিয়া পড়িয়া, দুই বাহুতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া, উঠাইয়া বসাইল। ষোড়শীর স্কন্ধের উপর মুখ রক্ষা করিয়া বিন্দু বহুক্ষণ ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিল। পুরুষেরা বৃদ্ধার মৃতদেহ যখন বাহিরে লইয়া গেলেন, তখন বিন্দু আবার মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল!

ষোড়শী চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিল, "বোঠান্ ঘরে চল্!—ওঠ্, নিজেই বুকে বল বাঁধ্তে হবে!"

ক্রন্দন জড়িতকণ্ঠে বিন্দু কহিল, "এই ভিটের উপর পড়ে থেকে যে মর্‌ব, সে অধিকার থেকেও আজ বঞ্চিত হলেম, ঠাকুরঝি!"

ষোড়শী এবার কোনও সান্ত্বনা দিতে পারিল না। শুধু দুই হাতে বিন্দুর মাথাটা টানিয়া আনিয়া বুকের কাছে চাপিয়া ধরিল; আসন্ন ক্রন্দন বেগটাকে কোনও মতেই রোধ করিতে না পারিয়া ষোড়শী কাঁদিয়া কহিল, "না বিন্দু, দুর্ভাগ্য জিনিষটাকে অত বড় করে দেখ্তে নেই; সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত

হওয়ার মত অবস্থা যদিও তোর নয়, তবুও বুকে বল বাঁধ্‌তেই হবে! মেয়ে মানুষকে যে কতখানি সহ্য কর্ত্তে হয়, তার তো সীমা ঠিক করে দেওয়া নাই, বোঠান্‌!”

চুণীর মাতার স্বর্গারোহণের পর একাকিনী বিন্দুর পক্ষে শ্বশুরের ভিটায় পড়িয়া থাকা একেবারেই অসম্ভব হইল। সংবাদ পাইয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিল! যে কিছু জমিজমা ছিল, বিশ্বাসী গোমস্তা বিহারী মল্লিকের উপর তাহার আদায় তহশীলের ভার দিয়া, এবং বাড়ী রক্ষণাবেক্ষণের যথোচিত বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া অশ্রুমুখী বিন্দু দুইদিন পরেই ভ্রাতার সঙ্গে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল! যাইবার সময়ে ষোড়শীকে কহিল,—

“ঠাকুরঝি চল্‌লাম, আর হয় তো এ ভিটায় ফির্‌ব না, কিন্তু তোর সঙ্গে যদি আর দেখা না হয়, তবে কেমন করে যে বাঁচ্‌ব তা’ জানিনে।” বিন্দুর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। দুইচক্ষু প্লাবিত করিয়া অশ্রু নামিয়া আসিল! ষোড়শী কহিল, “আমিই কি তোকে না দেখে থাক্‌তে পার্‌ব, বিন্দু? আমি নিজেই তোর সঙ্গে দেখা কর্‌ব! তুই অমন করে চোখের জল ফেলিস্‌ না;— অত নিরাশ হলে চল্‌বে কেন? একদিন সব বিপদ কেটে যাবেই। তোর জীবনটার উপর সত্যি চিরদিনই আর এমনি করে অন্ধকার চেপে থাক্‌তে পার্‌বে না, একদিন আলো দেখা যাবেই।” বিন্দুর অশ্রুক্লিষ্ট মুখের উপর দিয়া একটি ম্লান হাসি, বর্ষণভূয়িষ্ঠ মেঘের উপর চকিত বিদ্যুৎস্ফুরণের মতই খেলিয়া গেল।

বিন্দু কহিল,—"তা' আলো আস্‌বে বই কি ?—তবে সেটা চিতার আগুনের আলো কিনা, তা' কিন্তু ঠিক্ করে বলা যাচ্ছে না, ঠাকুরঝি !" ষোড়শী কথাটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিল, কিন্তু সে হাসিতেই পারিল না ! তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল ! সে কোনও কথা না কহিয়া দুইহাতে বিন্দুর হাতখানি চাপিয়া ধরিল !

কিন্তু বিন্দু হাসিল, সে হাসিটুকুও পূর্ব্বের মতই অশ্রুম্লান। কহিল, "মনে থাকে যেন, ঠাকুরঝি, মাঝে মাঝে দেখা দিতে ভুলিস্‌নে ! তুই যতদিন দেখা না দিবি, আমি ততদিনই শুধু তোর পথ চেয়েই বসে থাক্‌ব ! এরপর দুনিয়ায় আমার তো আর কোনো কাজই রইল না, শুধু তোর পথ চেয়ে থাকা ছাড়া ! তাই মনে করে যখনি অবসর পাস্, আসিস্।" কথা বলিতে বলিতে বিন্দু কাঁদিয়া ফেলিল, ষোড়শীও কাঁদিল।

তারপর বিন্দু ষোড়শীকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার ললাটে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া বিদায় হইল !

বিন্দুর গাড়ী দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেলে, ষোড়শী অঞ্চল-প্রান্তে চক্ষু আবৃত করিয়া পথের ধূলার উপরই বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "তীর থেকে কতটা দূরে যে তোর নৌকা ডুবেছে, তা' তো তুই কিছুই জানতে পারিস্‌নি বিন্দু !"

৬

বিন্দু পিত্রালয়ে যাওয়ার পর প্রায় তিন বৎসর কাটিয়া গেল !

ইতিমধ্যে ষোড়শী কয়েকবার বিন্দুর পিত্রালয়ে আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছে।

বিন্দুর শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। কুসুমস্তবকনম্রা লতিকাটীর মত সর্ব্বাঙ্গের সে লাবণ্য আর নাই। চোকের কোণে কালি পড়িয়াছে, কণ্ঠার হাড় জাগিয়াছে!

বালা দু'গাছি আর তেমন করিয়া শীর্ণহাত দু'খানিতে আঁটিয়া থাকে না বলিয়া বিন্দু বালা খুলিয়া ফেলিয়াছে! শাঁখারি আসিলে ছোট শাঁখা কিনিয়া পরিয়াছে। চুলগুলি রুক্ষ; অযত্নে জটা বাঁধিবার উপক্রম হইয়াছে। কেহ কিছু বলিলে একটু হাসিয়া বলে, "একটা বোঝা হয়েছে এগুলি কেটে ফেল্‌ব!"

বিন্দু সময়ে আহার করে না; বসিয়া বসিয়া ভাবে; দেখিয়া শুনিয়া মাতা কবিরাজ ডাক্তার ডাকিলেন, ঔষধ করিলেন, বিন্দু মাকে ফাঁকি দিয়া জানালা গলাইয়া ঔষধ ফেলাইয়া দিত। জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "খাইয়াছি"; বেশী পীড়াপীড়ি করিলে বলিত, "ঔষধ খেয়ে কি হবে; আমি খাব না।"——

বিন্দুর মাতা কহিলেন, "আমি তো তোর মা, তুই আমার চোখের উপর এমন করে প্রাণটা দিবি, তা আমি কেমন করে সহ্য কর্‌ব, বল্‌!"

বিন্দু কহিল, "আমার অসুখ তো কিছুই নেই, কেন মা কবিরাজ ডাক্তার ডেকে কতকগুলি পয়সা নষ্ট কর? আমার ঔষধ খাবার কি হয়েছে?"—বিন্দুর মা অশ্রুসজল চক্ষে কহিলেন, "তোর শরীর যে একেবারে কালি হয়ে গেছে,—শরীরে কি কিছু আছে?"—"শরীর দিয়ে কি হবে?"—কথাটা বলিয়াই বিন্দু বুঝিল, মার কাছে এমন একটা কথা বলা ভাল হয় নাই! তাড়া-

তাড়ি কহিল, "তা' মা শরীর কি চিরদিনই এক রকম থাকে; কদিন একটু খারাপ হয়েছে, ও নেতে থেতে সেরে যাবে, তুমি অমন অস্থির হ'লে চল্‌বে কেন, মা?"

"যেমন পোড়া অদৃষ্ট করে এসেছিলাম, তাই তোর মুখেও আমাকে এ কথা শুনতে হ'ল!"—জননী চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া গেলেন। বিন্দু দুই হাতের মধ্যে মাথাটা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল, বিন্দু ভাবিল, "এ পোড়া শরীর দিয়ে কি হবে? কেন রাখ্‌ব? কার জন্য রাখ্‌ব? মরতেই যদি বসেছি তবে যত শীঘ্র এ দহনের শেষ হয় ততই ভাল! মার কষ্ট হবে, তা' উপায় কি? আমি বাঁচতে চাইলেও যে আমাকে মরতেই হবে!"

বিন্দুর মা ছেলেদের কাছে পত্র দিলেন। মধ্যম পুত্র বিজয় পুরীতে ডাক্তারী করে। মার পত্র পাইয়া সপ্তাহের জন্য বাড়ীতে আসিল। বিন্দুর শরীরের অবস্থা দেখিয়া বিজয় কহিল, "বিন্দুকে পুরী নিয়ে যাই, মা, সমুদ্রের হাওয়ায় ওর শরীরটা শুধরে যাবে!"—

বিন্দুর পুরী যাওয়াই স্থির হইল, তখন সে ষোড়শীকে লিখিল,—

"ঠাকুরঝি, পুরী যাচ্ছি; আশীর্ব্বাদ করিস্, পুরীর সমুদ্র জলে যেন আমার ছাই মিশতে পারে। কিন্তু একটা কথা, যদি না ফিরি, তোর সঙ্গে আর দেখা হবে না! ও কুলের সম্পর্কে এক তোকেই ডাক্‌বার অধিকার পেয়েছি, তুই একবার আয়,

ঠাকুরঝি ! তোকে না দেখে আমার মরা হবে না, লক্ষ্মীটি আমার !"—

ষোড়শী শিশিরের নিকট হইতে সপ্তাহের ছুটি নিয়া তাহার দেবরকে সঙ্গে লইয়া বিন্দুর পিত্রালয়ে আসিল। ষোড়শীকে পাইয়া এবার বিন্দুর মুখে হাসি দেখা দিল ! ষোড়শী কহিল, "তোর হাসি দেখে আমার বুকের মধ্যে যে কেমন অস্থির করে উঠ্‌চে বিন্দু !"—

বিন্দু কোনও উত্তর দিল না। আবার সেই ম্লান হাসিটুকুই তাহার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল !

বিন্দুর আলিঙ্গন হইতে কোনও মতে নিজেকে মুক্ত করিয়া ষোড়শী যেদিন চলিয়া গেল, সেইদিন বিকালেই বিজয়ের সঙ্গে বিন্দু পুরী রওনা হইয়া গেল !

মধ্যম শ্রেণীর মেয়ে গাড়ীতে উঠিয়াই বিন্দু দেখিল, গাড়ীতে একটি মাত্র যুবতী রহিয়াছে ; তাহার পাশের বেঞ্চের উপর আস্তৃত ক্ষুদ্র শয্যার উপর একটী নিদ্রিত শিশু ! গভীর অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে নিদ্রিত শিশুটির সুন্দর মুখখানি দেখা যাইতে-ছিল। যুবতী গাড়ীর ষ্টেশনের দিক্‌কার জানালার কাছে না বসিয়া বিপরীত দিকের জানালার কাছে, বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল ! গাড়ীতে কেহ উঠিল বুঝিতে পারিয়া একবার ফিরিয়া চাহিল। যে উঠিল, সে পরমাসুন্দরী এবং তাহারই প্রায় সমবয়স্কা দেখিয়া যুবতী নিশ্চিন্ত হইল। একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া, একবার ছেলের মুখের দিকে চাহিল, তারপর নবাগতার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "নমস্কার, আপনি কোথায় যাবেন ?"

বিন্দু একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, "পুরী যাব; আমি ঐ 'আপনি' কথাটা মোটেই পসন্দ করিনে; 'তুমি' বল্‌লেই ঠিক্ হবে! তুমি কোথায় যাবে, ভাই?"—

যুবতী কহিল, "ও কথাটায় যেন একটু আত্মীয়তায় বাধা দেয়,—তা ঠিক! তবে পথে ঘাটে চল্‌তে একটু সাবধান হয়ে কথা বল্‌তে হয়, এই যা!—আমি পুরী যাচ্ছি"—

—"সঙ্গে কে আছেন?"

বিন্দুর প্রশ্ন শুনিয়া যুবতী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু সলজ্জ মৃদুহাসি হাসিল!

—"ওঃ একেবারে স্বয়ং কর্ত্তা বুঝি!"—

বিন্দুর মুখেও মৃদুহাসি দেখা গেল! নূতন পরিচয় স্থাপনের সময়ে যদি উভয় পক্ষের মুখেই হাসি ফুটে, পরিচয় কার্য্যটা অতি সহজে এবং অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়—বিশেষ সমবয়স্কা যুবতীদিগের মধ্যে!

"বাঃ, খুব আলাপ কচ্ছি যা'হোক্, তোমার নামটাই যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে ভুলে গিয়েছি!"—

—"পদ্মা"—

"আমি বিন্দু,—বেশ নামটি তোমার কিন্তু, ভাই।"

"তা, তোমার নামটি অনেক বেশী সুন্দর! "বিন্দু"—বেশ নামটি! আমার একটি সইয়ের নাম, 'বিন্দু'"—

"বেশ মিলে গেছে ত!"—

"সব দিকেই মিলে যাক্ না!"—

"অর্থাৎ"—কথাটা বুঝিয়াও মুখ টিপিয়া টিপিয়া একটু হাসিতে হাসিতে বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল !

"অর্থাৎ তুমিও আমার 'সই' হলেই ঠিক্ মিলে যায়"—কথাটা বলিয়া ফেলিয়া পদ্মা বিন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া একটু সঙ্কোচ মিশ্রিত সলজ্জ হাসি হাসিল। পদ্মা দেখিল, যাহাকে কথাটা বলিয়াছে তাহার মুখশ্রী এমন সুন্দর, সরল যে দুদণ্ড তাহার কাছে থাকিলে তাহাকে ভাল বাসিতেই হইবে !

বিন্দুর ঈষৎ পাণ্ডুর মুখ খানির উপর এমন একটি বিষাদের ম্লান ছায়া পড়িয়াছিল, যাহা দেখিলেই তাহার উপর একটা মায়া হয় !

বিন্দু পদ্মার উষ্ণ, কোমল, পরিপুষ্ট হাতখানি নিজের শীর্ণ হাতের মধ্যে টানিয়া লইল, এবং একটু হাসিয়া কহিল, "তা' তোমার সে বিন্দু রাগ কর্‌বেনা ত !"

পদ্মা হাসিল,—"তা' রাগ করে তার সঙ্গেও না হয় তোমার পরিচয়টা করিয়ে দেব !"

"তা' কেমন করে হবে, দেখা ত আর হবে না !—"

এ যে অতি দ্রুত গন্তব্য পথাভিমুখী বাষ্পীয় শকটের মধ্যে বসিয়া তাহারা পরস্পরকে আপনার করিয়া লইতেছে, তাহা উভয়েই একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ বিন্দুর কথায় পদ্মা চমকিয়া উঠিল, কহিল, "সত্যি, এ বুঝ্‌লে তোমার সঙ্গে এতটা মাখামাখি কর্‌তাম না। আর হয় তো তোমার সঙ্গে দেখাই হবেনা ভাই !" পদ্মার চক্ষুর পাতা ভিজিয়া উঠিল। বিন্দু একটা গাঢ়

নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "তা, এ সংসারের পরিচয়টা এমনিই বটে ; কারু সঙ্গে দুদিন বেশী দেখা শুনা হয়, কারু সঙ্গে দু'দিন কম হয়। তা'তে প্রাণের টান্‌টা তো আর কমে যায় না।"

পদ্মা ম্লানমুখে কহিল, "তা'হলে তুমি বল, আমার কাছে নিয়মমত চিঠি পত্র লিখ্‌বে। আমিও লিখ্‌ব, তোমার ঠিকানাটা ভাই ?"—

পদ্মা তাহার হাত বাক্স খুলিল একখানি ছোট বাঁধানো খাতা বাহির করিল। বিন্দু কহিল, পদ্মা লিখিয়া লইল,—

"বিন্দুমতী দাসী।"

বাবু বিজয়কুমার বসু, এম, বি, মহাশয়ের বাসা—

পুরী।

ঠিকানা লিখিতে লিখিতে পদ্মা কহিল, "নিয়মমত বরাবর লিখ্‌বে ?"

বিন্দু একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "লিখ্‌ব,—অবশ্য যতদিন বাঁচি !"—

"কথার শ্রী দেখ !—" কথাটা বলিয়াই পদ্মার মনে হইল, বিন্দু সত্যই বড় কাতর, বড়ই রোগদুর্ব্বল। তখন সে খাতা বন্ধ করিতে করিতে কহিল, "তুমি বোধ হয় তোমার অসুখের জন্যই সেখানে যাচ্ছ ? তা' পুরীর হাওয়া খুব ভাল শীগ্‌গিরই সুস্থ হয়ে উঠ্‌বে !" বিন্দু একটু অন্যমনস্ক ভাবে কহিল, "অসুখ কিছু নেই ভাই, তবে মা মনে করেন যে, আমার অসুখ ; দাদাকে লিখেছিলেন, তাই দাদা এসে আমাকে নিয়ে যাচ্চেন।"—"ওঃ বিজয় বাবু তোমার

দাদা, আমি তো ভারি ভুল কর্‌ছিলাম! তোমার অসুখ নেই বল, কিন্তু এমন রোগাটি হয়ে গেছ যে?"—

বিন্দু কোনও উত্তর না দিয়া একটু হাসিল, তাহার হাসি দেখিয়া পদ্মার মনে হইল, বিন্দুর মুখের উপর যে একটি বিষাদের ম্লান ছায়া আছে, সেই ছায়াটা আরও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। বিন্দু কহিল, "খাতা বাক্সে রেখ না, পদ্মা! তোমার ঠিকানাটা তো আমাকে দিতে হবে।" "ওহো তা' যে একেবারে ভুলেই গিয়েছি।"—পদ্মা হাসিয়া আবার খাতা খুলিল!

এমন সময়ে শিশুটি কাঁদিয়া উঠিল! পদ্মা কহিল, "ছেলেটাকে ধরত, ভাই! ভারি দুষ্টু, অত্যাচার ক'রে অস্থির করে তুল্‌বে কিন্তু!"

বিন্দু ছেলে তুলিয়া কোলে লইতে লইতে দেখিল, পদ্মা খাতার একটা পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া অতি সুন্দর মুক্তার মত অক্ষরে ঠিকানা লিখিল,

"শ্রীমতী পদ্মা দত্ত।"
শ্রীযুক্ত চুণীলাল দত্ত উকীলের বাসা
——"পুর"——

বিন্দুর চক্ষের সম্মুখে গাড়ীর অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকটা যেন হঠাৎ নিবিয়া গেল! চলন্ত গাড়ীর গভীর গর্জ্জন ও বংশীধ্বনি কাণে আসিতেছিল, মনে হইল, বুঝি প্রলয়ের বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ওলটপালট করিয়া দিয়া একটা বিরাটদৈত্য তাহাকেই গ্রাস করিবার জন্য গর্জ্জন করিতে করিতে

ছুটিয়া আসিতেছে! ছেলেটীকে বুকের সঙ্গে আঁকড়িয়া ধরিয়া বিন্দু টলিতে টলিতে বেঞ্চের উপর পড়িয়া গেল!

পদ্মা খাতা ফেলিয়া দুইহাতে বিন্দুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "অমন হয়ে পড়্‌লে কেন, ভাই?"

মূর্চ্ছাতুর বিন্দুর মাথাটী পিছনের কাঠটার উপর গড়াইয়া পড়িল।

এমন সময়ে গাড়ী থামিয়া গেল। দুয়ারটা খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে কেহ ডাকিল, "ওগো, এখানেই নাম্‌তে হবে যে। খোকাকে আমার কাছে দাও,—এই কুলী, কুলী! বাক্স নাবিয়ে ফেল্‌তো বাপু!"—

আগন্তুক গাড়ীর মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যস্তভাবে কহিল, "ওকি? কি হয়েছে!" পদ্মা দ্রুত কণ্ঠে কহিল, "এঁর দাদাকে ডেকে দাও,—বিজয় বাবু বলে ডাক, পাশের গাড়ীতেই হয়তো আছেন! হঠাৎ ইনি অজ্ঞানের মত হয়ে পড়েছেন!" "আচ্ছা আমি ডাক্‌ছি, তুমি নেমে পড়, গাড়ী মোটে পাঁচমিনিট দাঁড়াবে কিন্তু!" পদ্মা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "আগে ডাক তুমি এঁর দাদাকে,—নইলে আমি নাম্‌বই না!"

আগন্তুক ছুটিয়া গেল; ইতিমধ্যে বিন্দু কতকটা সাম্‌লাইয়া লইয়া মাথা তুলিয়া শূন্য দৃষ্টিতে একবার পদ্মার মুখের দিকে চাহিল!

পদ্মা অশ্রু-জড়িত দ্রুত কণ্ঠে কহিল, 'সই, সই,—বিন্দু আমরা যে এখানেই নাম্‌ব; কেন তুমি এমন হয়ে পড়্‌লে! চিঠি লিখো

কেমন থাক। আমার যে তোমাকে এ অবস্থায় রেখে নাম্‌তেই ইচ্ছে হচ্ছে না! সই—সই।”—

বিন্দু আর একবার উদাস দৃষ্টিতে পদ্মার মুখের দিকে চাহিল! পদ্মা দেখিল, তাহার মুখখানা একেবারে কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে।

“সই,—বিন্দু!”

দুয়ারের কাছে আবার ত্রস্ত কণ্ঠস্বর শুনা গেল,—“বিজয় বাবু আস্‌ছেন! নেমে পড়, দূর ছাই, গাড়ী যে ছেড়ে দিল।” বিন্দুর দুই-হাত টানিয়া ধরিয়া, অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে পদ্মা আবার ডাকিল, “বিন্দু”—

বিন্দু অস্ফুট কাতরস্বরে কহিল, “খোকাকে আর একবারটি আমার কোলে দে’, পদ্মা!” পদ্মা খোকাকে বিন্দুর কোলে দিল, বিন্দু অবোধ শিশুকে দুইহাতে বুকের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার ললাট, কপোল, চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিল!

খোকাকে বিন্দু যখন পদ্মার কোলে দিল, তখন গাড়ী ছাড়িয়াছে! আগন্তুক পদ্মাকে ও খোকাকে কোনও মতে টানিয়া নামাইয়া দিলেন!

চলন্ত গাড়ী হইতে পাদানি ছাড়িয়া নামিবার সময় আলোকোজ্জ্বল কক্ষের মধ্যে বিন্দুর মুখের উপর একবার আগন্তুকের দৃষ্টি পড়িল!

একটা তপ্ত লৌহশলাকা সজোরে মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলে মানুষ যেমন করিয়া আর্ত্তভাবে চীৎকার করিয়া উঠে, আগন্তুক তেমনি চীৎকার করিয়া পাদানির উপর হইতে সবেগে নামিয়া পড়িল!

পদ্মার কাছ হইতে গাড়ী তখন অনেকটা সরিয়া আসিয়াছে! বাষ্পীয় শকটের গর্জ্জন সে আর্ত্তচীৎকারকে প্রায় ডুবাইয়া দিল!

পদ্মাও বিন্দুর চিন্তায় অন্যমনস্ক ছিল, সুতরাং সে চীৎকার ধ্বনি পদ্মার কাণে গেল না!

অস্থির চঞ্চলপদে পদ্মার কাছে আসিয়া বিকৃত স্বরে চুণী কহিল,

"ও কেও, পদ্মা?"—

পদ্মা বিস্মিত ভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "ও বিন্দু; আমার সই; তা' তুমি অমন কর্‌ছ কেন?"

চুণী কম্পিত হস্তে কুলীর মাথায় বাক্স তুলিয়া দিতে দিতে কহিল, "না, কিছু না!" নিঃসঙ্গ বিন্দু তখন গাড়ীর পাটাতনের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল!

৭

চুণী যে দিন জীবনের হাল্‌টাকে একটু বেশী করিয়া চাপিয়া ধরিয়া, একটি বক্রপথে আপনাকে উঠাইয়া দিল, সেদিন সে মনে করিয়াছিল, বাঁকটা একটু ঘুরিয়া যাইয়াই আবার জীবনগতির যথানির্দ্দিষ্ট দৈনন্দিন পথটিই অবলম্বন করিবে। কিন্তু পথটি এতই বক্র, এবং তাহার এতই অপরিচিত যে, সে কোনও মতেই আর সেই চির পুরাতন পথটির সন্ধান পাইল না, এবং কিছুকালের মধ্যেই এমন একটা সময় আসিয়া পড়িল, যখন প্রতিকূল স্রোত ও তরঙ্গের মুখে সে আর কিছুতেই ফিরিতে পারিল না।

মানুষের নাকি চিন্তা ও কল্পনা করিবার অধিকারই আছে,

কিন্তু সেই চিন্তা ও কল্পনাকে নিশ্চিত সার্থকতা প্রদান করিবার অধিকার ত আহার নাই ; এবং সেজন্য মানুষকে চিরদিনই এক অদৃশ্য শক্তির ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিয়া আসিতে হইতেছে।

ঊর্ণনাভের মত চুণী যখন নিজের চারিদিকে একটা জাল রচনা করিতেছিল, তখন সে একবারটিও মনে করে নাই যে, তাহার ঐ স্বহস্তে রচিত জাল তাহার পক্ষে একদিন একান্তই দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিবে, এবং একদিন সে বিস্ময়শঙ্কা-চকিত চক্ষে চাহিয়া দেখিবে, যে, নির্ম্মম নিষ্ঠুর অদৃষ্ট তাহাকে সেই জালবেষ্টনীর মধ্যে এমনই নিবিড়ভাবে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছে, যে সেই জালবেষ্টনী ছিন্ন করিয়া তাহার বাহির হইয়া আসিবার এতটুকু উপায়ও আর বর্ত্তমান নাই।

চুণীর অনন্যসাধারণ গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া সবজজ উপেন্দ্র-বাবু যে দিন তাহার কন্যা পদ্মাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন, সেদিন কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভের দিনে অবিবাহিত বলিয়া যে মিথ্যাটাকে চুণী মৌনসম্মতি দ্বারা প্রচারিত হইতে অবসর প্রদান করিয়াছিল, তাহার বিষাক্ত প্রথম ফলটি সে স্বেচ্ছায় নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সেদিনও, তাহার বিবেক বুদ্ধি যতটাই রূঢ় আঘাত প্রাপ্ত হউক না কেন, সে ভাল করিয়া বুঝিতেই পারে নাই, যে এই ফলটিই অদূর ভবিষ্যতে তাহার পক্ষে কতখানি তীব্র বিষপূর্ণ হইয়া উঠিবে। সমুদ্রমন্থনের পর যখন চুণীর অদৃষ্টে লক্ষীলাভই ঘটিল, তখন সে একেবারেই ভুলিয়া গেল, যে, এই সমুদ্রমন্থনকালেই, এক অশুভ মুহূর্ত্তে হলাহল উত্থিত হইয়া

সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল। সেই হলাহল যে তাহাকেই একদিন নীলকণ্ঠের মত আকণ্ঠপান করিতে হইবে, তাহা সে মুহূর্ত্তের জন্য স্বপ্নেও মনে করিতে পারে নাই।

পদ্মার স্পর্শ, পদ্মার প্রেম চুণীর প্রাণের মধ্যে একটা উন্মাদ-বন্যার প্রবাহ জাগাইয়া তুলিয়া তাহার হৃদয়ের সমস্ত পঙ্কিল দৈন্যকে ডুবাইয়া দিয়াছিল!

দুঃস্বপ্নের স্মৃতি প্রথমটাই মানুষের হৃদয়ে একটা গভীর দাগ কাটে এবং দিনের আলোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সেই দাগটা যেমন ধীরে ধীরে মিশাইয়া যায়, তেমনই বিন্দুর স্মৃতিটি চুণীর হৃদয়ে কিছুদিনের জন্য একটা নির্দ্দিষ্টস্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান ছিল, তাহার পর পদ্মার প্রখর প্রেমালোকে সেই স্মৃতিটুকু কখন মিলাইয়া গেল!

পদ্মাকে পাইয়া চুণীর মনে হইল, এতদিনে তাহার কল্পনা সার্থক হইয়াছে; কমলা কখন তাহার মায়াস্পর্শ [illegible] চুণীর রসশূন্য মরুপ্রায় জীবনটাকে রসপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন, পান করিবার জন্য তাহারই মুখের কাছে স্বহস্তে সুধাভাণ্ড ধারণ করিয়াছেন। চুণী আকণ্ঠ পান করিয়া জগৎসংসার ভুলিয়া রহিল!

সেদিন যখন মুহূর্ত্তের জন্য চুণী চলন্ত গাড়ীর পাদানির উপর হইতে বিন্দুর রোগ-পাণ্ডুর মুখখানি প্রত্যক্ষ করিল, তখন বহু-দিনের লুপ্তপ্রায় স্মৃতিটা জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে অতি নিষ্ঠুর-ভাবে আঘাত করিল। যাহাকে সে একদিন অতি নির্ম্মমভাবে পদদলিত করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, আজ তাহার রোগশীর্ণ, পাণ্ডুর

মুখখানি ক্রমাগতই তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। জোর করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই ছায়াকে অপসারিত করা গেল না; কর্ম্মের ব্যস্ততার মধ্যে সেই সন্ত্রস্ত, মূর্চ্ছাতুর দৃষ্টিটুকুকে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব হইল না! আজ পদ্মার সুধাভাণ্ডে এমন অমৃত পাওয়া গেল না, যাহা দুর্ভাগ্য চুনীর কাছে সেই মুহূর্ত্তদৃষ্টা বেপথুমতী বিন্দুর স্মৃতিটুকুকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারে! চুনী ভাবিল, যাহাকে একদিন সে বিসর্জ্জন করিয়া, চলিয়া আসিয়াছে, অদৃষ্টের কোন্ নিষ্ঠুর সঙ্কেতে আবার সে তাহার জীবনপথের উপর এমন অতর্কিতে আসিয়া পড়িল?

মুহূর্ত্তের পরিচয়ে পদ্মা যাহাকে সখীত্বে বরণ করিয়া লইয়াছে, সে যে পদ্মার কি, হায়, পদ্মা যদি তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিত! কিন্তু বিন্দু ত জানিয়াছে!—বিন্দু ত জানিয়াছে, তাহাকে গণ্ডীর বাহিরে রাখিয়া তাহার স্বামী নিজের সুখ ও তৃপ্তিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য এমন একটি সংসার রচনা করিয়া তুলিয়াছেন, যেখানে তাহার প্রবেশ করিবার এতটুকু অধিকারও নাই।

আজ চুনীর হঠাৎ মনে হইল, এ সে কি ভুলই করিয়া বসিয়াছে!

যে নারী লতিকাটির মত তাহাকেই বেষ্টন করিয়া উঠিতে চাহিতেছিল, তাহাকে সে পথের ধূলায় মিশাইয়া দিয়াছে; যাহাকে সে ইচ্ছা করিলেই সুখী করিতে পারিত, তাহার মুখের হাসিটুকু সে চিরদিনের জন্য নিভাইয়া দিয়াছে! আজ যে

তাহাকে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখাটির মতই পরিম্লান দেখিয়া আসিল,—কেন দেখিল ?

এই যে স্বপ্নের ছায়ার মত সংসারের দুঃসহ জীবনালোকের সম্মুখে সে ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে,—কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য চুণী নিজের অন্তরের দিকে চাহিল, দেখিল, সেথানে দারুণ দৈন্যপূর্ণ চকিত শিহরণ জাগিয়া উঠিয়াছে !

৮

পুরী যাইয়াই বিন্দু ষোড়শীকে চিঠি লিখিল, "ঠাকুরঝি, বাড়ী থেকে রওনা হওয়ার পূর্ব্বে একদিনও মনে কর্ত্তে পারিনি, যে আমার জীবনেও এমন একটা দিন আস্‌তে পারে, যেদিন আমি মরণকে অসুন্দর বলে মনে কর্‌ব, এবং তাকে দূরে রাখ্‌তে চাইব ! কিন্তু সত্যি ভাই, আজ যে আর আমার মর্‌বার ইচ্ছা এতটুকুও নাই ; এ কথাটা বল্‌লে তুই হয়ত খুব বিস্মিত হয়ে যাবি ! কিন্তু এ অভাগীর জীবনে এমন একটা মুহূর্ত্ত এসে পড়েছে, যখন সেও আর কিছুদিন সংসারে থেকে যেতে চায় ; পুরী আস্‌বার পথে, গাড়ীতে এমন একজন আমাকে সখীত্বে বরণ করেছে, তার পরিচয় নিয়ে জান্‌তে পেরেছি, যে, সে শুধু আমার সখীই নয়, তা' ছাড়া এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার সঙ্গে আমার রয়েছে, যে সম্পর্কটাকে নারীজাতিটা সাধারণতঃ বড় ঈর্ষার চক্ষেই দেখে থাকে !

পদ্মা যে আমার 'সতিন' একথা যখন প্রথম বুঝ্‌তে পার্‌লাম, তখন সহস্র চেষ্টা করেও যে আমি নিজেকে স্থির রাখ্‌তে পারি

নাই, এজন্য আজ সত্যিই আমার ভারি লজ্জা বোধ হচ্ছে। প্রথম অস্থিরতাটা কেটে গেলে যখন পদ্মার দিকে চাইলাম, তখন দেখ্‌লাম কোলের শিশুটি আমার দিকে তার শান্ত দৃষ্টি তুলে চেয়ে আছে! তাকে পদ্মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে বুকে চেপে ধর্‌লাম; সেই মুহূর্ত্তে আমার অন্তরের সমস্ত দৈন্য কেটে গেল, আমার হারাণ গর্ব্ব ও অধিকার আমি ফিরে পেলাম! সেই শিশুর একদিনকার সেই মুহূর্ত্তের স্পর্শ আমার কাছে আমার কাম্য মৃত্যুকেও অসুন্দর করে তুলেছে! আজ সেই ক্ষুদ্র অবোধ শিশুটিই আমার কাছে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কামনার ধন হয়ে উঠেছে! তাকে আবার কবে এবং কি কৌশলে দেখ্‌তে পাব এইটেই এখন আমার সব চেয়ে বড় চিন্তা হয়েছে।

পদ্মাকে আমি আমার পরিচয় ত দিই নাই,—কিন্তু এটা ঠিক, যখনই তার কাছে যাব তখনই সে আমাকে তার সখী বলে সাদরে ডেকে নেবে! তবে কোনও দিন ছেলের উপর দাবী করে তার কাছে দাঁড়াব কিনা, তা' আমি আজও ভাল করে ভেবে দেখিনি! কয়েক দণ্ডের মধ্যে তার হৃদয়ের যে একটি পরিচয় আমি পেয়েছি, তাহাতে পদ্মার কাছে হয়ত কিছুই পাওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে! আর আমি ত ছেলেই চাই,—ছেলে ছাড়া আমি কোনও দিনই যে তার কাছ থেকে আর কিছু ভাগ করে নিতে চাইব না, তা ঠাকুরঝি, আর কেউ বিশ্বাস না করুক্‌, তুমি অন্ততঃ নিশ্চয়ই কর্‌বে।

পদ্মা যা ঠিকানা দিয়াছে, সে ত তোমাদেরই এক সহরের

ঠিকানা। তাকে তুমি, লক্ষ্মীটি আমার, খুঁজে বের কর, এবং আমাকে জানাও আমি একেবারে তোমার কাছেই যেয়ে পড়্‌ব, এবং ওখানেই আমার মরা বাঁচা যে হউক একটা স্থির হয়ে যাবে !" ষোড়শী বিন্দুর চিঠি পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল ! শিশিরকে চিঠি দেখাইল। শিশির চিঠি পড়িয়া কহিল, "তোমার চুণীদার দুর্ভাগ্য যে তিনি এ রত্ন চিনিতে পারেন নাই।"

ষোড়শী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "যে কথাটা এতদিন তার কাছে গোপন ছিল, এমন করে হঠাৎ যে সে কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়্‌বে তা একবারটিও মনে করিনি !"

শিশির একটু হাসিয়া কহিল, "সংসারে অনেক গোপন তথ্যই এমনই করে প্রকাশ হয়ে পড়ে থাকে, তা'তে বিস্ময়ের কিছু নেই, রাণী !"—

"সে ত মর্ত্তেই চলেছিল,—কিন্তু এই দুঃসহ বেদনাকে সহ্য কর্‌বার মত শক্তি তার আছে বলেই বোধ হয় ঠাকুর তা'কে ঠিক শেষ মুহূর্ত্তেই এমন করে সব জানিয়ে দিলেন। কিন্তু এমন করে বুক পেতে যে সে এই আঘাতটাকে গ্রহণ করতে পার্‌বে, তা' আমি কোনও দিনই মনে করিনি !"— ষোড়শীর দৃষ্টি অশ্রুম্লান হইয়া আসিল ! শিশির একটু হাসিয়া কহিল, "ত' এমনটা হ'লে তুমি সহ্য কর্‌তে পার্‌তে ?"

"ইঃ,—আমার এমনটা হবেই কেন ?"

—"বটে !—এত জোর !" শিশির দুটি অঙ্গুলি দ্বারা ষোড়শীর সূক্ষ্ম অধর পুট একটু টিপিয়া ধরিয়া নাড়িয়া দিল !

ষোড়শী শিশিরের কাছে সরিয়া আসিল এবং দুই বাহুতে তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিয়া মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল।

শিশির তাহার কপোল টিপিয়া দিয়া অনুচ্চস্বরে কহিল, "ভারি দুষ্টু!"—পরদিন ষোড়শী বিন্দুকে চিঠি লিখিল—"বোঠান্, যে খবর সেদিন হঠাৎ জেনেছিস্ তা' আমরা দু'বছর পূর্ব্বেই জান্তে পেরেছিলাম। কিন্তু কোনও দিনই মনে কর্ত্তে পারি নাই, যে, তুই এই দারুণ আঘাতটাকে এমন করে বুক পেতে গ্রহণ কর্ত্তে পার্‌বি! তাই সাহস করে তোকে সব কথা বল্‌বার কল্পনাও কর্ত্তে পারি নাই, তুই এমন, তা ত জান্‌তাম না, বিন্দু! আজ বড় গর্ব্বে আমার বুক ভরে উঠেছে! তোকে দেবীর আসনে বসিয়েও আমার তৃপ্তি হচ্ছে না!

তুই এখানেই চলে আয়, লক্ষ্মী! আর কিছু না হোক্ তোর খোকাকে তুই দিনান্তেও একটিবার দেখ্‌তে পাস্ সে সুবিধা ত করা যাবে। তারপর যিনি এত ব্যাপার ঘটিয়ে তুল্‌তে পারেন, তাঁর মনে যা আছে তাই হবে!"

বিন্দু ষোড়শীর চিঠি যেদিন পাইল তার পর দিনই পদ্মার একখানি চিঠিও পাইল। চিঠি খানাতে সংক্ষেপে কয়েকটি লাইন মাত্র লিখিত ছিল!

"তোমাকে অমন অবস্থায় সেদিন গাড়ীতে রেখে এসে মনটা বড়ই অশান্ত হয়ে উঠেছে, তার উপর এখানে এসেই খোকার অসুখ হয়ে পড়াতে আরও উদ্বেগ ভোগ কর্‌ছি। যদিও কয়েক দণ্ডের দেখা, তবুও মনে হয়, তুমি যেন আমার কত আপনার

জন ;—বোধ হয় পূর্ব্ব জন্মে মায়ের পেটের বোন্ ছিলে ! তোমার খবর দিও বিন্দু ! খোকার অসুখটা একটু বেশীই হয়ে পড়েছে, একটু কম্‌লেই তোমাকে বিস্তারিত লিখ্‌ব !”

পদ্মার চিঠি পাইয়া বিন্দু বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল ! একটা নূতনতর উদ্বেগের অনুভূতি তাহাকে সমস্ত দিনটা ধরিয়াই আকুল করিয়া তুলিতেছিল। তাহার শঙ্কাচঞ্চল বক্ষের মধ্যে শুধু দুটি কথাই রহিয়া রহিয়া বাজিতেছিল, “খোকার অসুখ—খোকার অসুখ !”—একি দুঃসহ উদ্বেগ,—খোকাকে দেখিবার জন্য একি আকুল আগ্রহ, তাহাকে অস্থির করিয়া তুলি-তেছে ! বিন্দু কতবার পদ্মার চিঠি পড়িল ;—কতবার ষোড়শীর চিঠি পড়িল : আজ আর তাহার মন যেন কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহিতেছে না ! বিন্দু অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, ষোড়শীর কাছেই যাইবে। তাহার মনে হইতেছিল, খোকাকে দিনান্তে একটিবার করিয়া দেখিতে পারিলেও সেইটাই তাহার পক্ষে পরম ও চরম লাভ হইবে !

৯

প্রায় দুই সপ্তাহ পরে একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে একটি ছোট কক্ষের মধ্যে বিন্দু অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিয়াছে !

ঘরের পাশেই একটা কামিনীফুলের গাছ ছিল। মৃদু বায়ু স্পর্শে স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে। পূর্ব্ব দিনকার প্রস্ফুটিত ফুল গুলির কতক দল ঝরিয়া পড়িয়াছে, কতক তখনও গাছে আছে। তবে সেগুলি কিছু ম্লান হইয়া পড়িয়াছে।

একটা কালো রংএর প্রজাপতি তখনও ফুলের কাছে কাছে উড়িতেছিল!

বিন্দু প্রজাপতিটার চঞ্চল নৃত্য লক্ষ্য করিতেছিল কি না ঠিক বুঝা যাইতেছিল না, তবে তাহার দৃষ্টি সেই দিকেই নিবদ্ধ ছিল!

এমন সময়ে ষোড়শী আসিয়া ডাকিল, "বোঠান্—"

বিন্দু একটু চমকিয়া উঠিয়া ষোড়শীর দিকে ফিরিয়া চাহিল।

—"তোর হয়েছে কি বল্ ত? আজ আর ও বাসায় গেলি না, কেন লা?"—

বিন্দু একটু ম্লানহাসি হাসিয়া কহিল, "তা সবদিন যে যেতেই হবে এমন ত কোনও কথা নাই, ঠাকুরঝি!"

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বিন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ষোড়শী কহিল, "তা যেন বুঝ্‌লাম, আসল কথাটা কি খুলে বল্ ত"—

"আসল কথাটা ছেলে আরাম হয়ে উঠেছে, এখন অত বেশী না গেলে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নেই ত!"—

বিন্দুর উত্তর শুনিয়া ষোড়শী তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর কহিল, "হুঁ, তা বুঝ্‌লাম, ছেলে দেখ্‌বার জন্যেই মরণ ফেলে ছুটে এলি,—এখন 'ক্ষতি বৃদ্ধি' নেই,—সে কি রকম?"

বিন্দু একটু জোর করিয়া একবার গলা ঝাড়িয়া লইয়া জবাব দিল, "এর আর রকম কি বাপু? কোনও কথা ত সোজা ভাবে নেওয়া তোর কোষ্ঠিতে লেখেনি!"

ষোড়শী হাসিল। সে হাসিটুকু কৌতুহলে, বেদনায়, সহানু-

ভূতিতে পরিপূর্ণ,—হাসির নিম্নেই বুঝি অশ্রু চাপা দেওয়া ছিল। তাই ষোড়শীর মুখে সেই হাসিটুকু বড় সুন্দর মানাইল।

ষোড়শী কহিল,—"দেখ্ বোঠান্, তোর নিজের বুদ্ধির দোষেই তুই মর্‌লি—"

বিন্দু হাসিয়া বাধা দিয়া কহিল, "মর্‌তে না পেরেই ত তোর কাছে ছুটে এলাম, ঠাকুরঝি—কিন্তু এখন দেখ্‌ছি"—বিন্দু চুপ করিল, একবার মুখ তুলিয়া ষোড়শীর মুখের দিকে চাহিল, তারপর আবার বাহিরের কামিনী ফুলগাছটার দিকে চাহিল; তখন তাহার কৃষ্ণায়ত চক্ষু দুইটা জলসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, একটা নিবিড় ক্রন্দনের বেগ কণ্ঠ নিপীড়িত করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল; বিন্দু দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া সে বেগটাকে রোধ করিতে চাহিতেছিল! ষোড়শী মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি দেখ্‌লি বিন্দু?"—

—"বুঝি না আসাই ভাল ছিল—"

—"এতদিন ত এ কথা বলিস্ নাই, আজ এমন কথা বল্‌লি কেন?"

"একটা পাতান সুখের সংসার,—আমি তা' কোন্ অধিকারে ভাঙ্‌তে আস্‌লাম, ঠাকুরঝি?"

"কেন, তুই ত ধরা দিস্ নাই, দিতেও চাস্ না, তবে ভাঙ্‌তে এলি কেমন করে?"—

"ধরা দিতে আসিনি সত্যি, কিন্তু ধরা পড়্‌তে কতক্ষণ? আর —আর" বিন্দুর কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল।

—"আর কি?"—

"ধরা পড়েছিও বোধ হয় ;—ধরা পড়্‌লে কে বিশ্বাস কর্‌বে, যে, আমি এমন হীনভাবে ধরা দিতে আসি নি? আমি পুরী ছেড়ে এসে ভাল করিনি, ঠাকুরঝি,—আমার সেখানে পড়ে মরাই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল ছিল। পদ্মা সুখের সংসার সাজিয়ে তুলেছে,—আমি একটা অভিশাপের মত সেই সংসারের মাঝখানে কেন এসে পড়্‌লাম? ছেলে দেখে সব ভুলে গিয়াছিলাম, এতটা ত কোনও সময়েই ভাবিনি, ঠাকুরঝি!"

—"সত্যি ত আর ধরা পড়িস্‌ নি, তবে এত ভেবে মরিস্‌ কেন?—পদ্মা তোকে কেমন করে চিন্‌বে?—ছেলের অসুখ, আর তুই তার সই, সেই ভাবেই না রোজ যাচ্ছিস্‌!"

—"কিন্তু কাল ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে, তা'তে আর আমার সেখানে যাওয়া ত চল্‌বেই না, বেশীর ভাগে কেউ যদি মনে করে, যে, আমি শুধু সংসারটাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্যেই এসেছিলাম, তাহলে, একথা যে মনে কর্‌বে তাকে একটুও দোষী করা যাবে না ত! সোজা কথায় অর্থটা ঠিক্‌ ঐ রকমই দাঁড়ায় কি না, আমার দিকে না টেনে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করে দেখ্‌ত, লক্ষ্মীটি!"—

—"রাখ্‌ তোর বিচার,—কি হয়েছে ছাই, খুলেই বল্‌ না, তোর একটা মহৎ দোষ এই যে, তুই কিছুতেই পেটের কথা বার কর্‌তে চাস্‌নে!"—বিন্দু একটু ম্লানহাসি হাসিয়া কহিল, "অন্ততঃ তুই ত সে দোষটা আমার উপর চাপাতে পারিস্‌ নে! তোর কাছে ত আমার কিছুই গোপন নেই, ঠাকুরঝি!—"

বিন্দু আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই খোকার অসুখ অনেকটা আরাম হইয়া গিয়াছিল।

খোকা ঘুমাইতেছিল; জাগরণ ক্লান্ত পদ্মাও ছেলের পার্শ্বে পড়িয়া ঘুমাইতেছে, চুণী কয়েকদিন পরে কাছারী গিয়াছে। হঠাৎ অতর্কিত চরণশব্দে পদ্মার তন্দ্রা ভাঙ্গিল; সে তাহার ঈষৎ নিদ্রাবেশ-স্ফীত চক্ষু দুইটি তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, দুইটি নারী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যে খোকার শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অশ্রু-সিক্তনেত্রে তাহার রোগপীড়িত মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, পদ্মা তাহাকে চিনিল, সে বিন্দু! ষোড়শীকে সে কোনও দিন দেখে নাই; ষোড়শী পদ্মার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। মুখখানিতে এমন একটা কিছু ছিল যাহা প্রথম দৃষ্টিতেই স্নেহ আকর্ষণ করে। তখনও নিদ্রার মৃদু আবেশ ছিল বলিয়া পদ্মার মনে হইল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে। বিন্দু কখনও এমন করিয়া তাহার কাছে আসিয়া পড়িতে পারে, ইহা পদ্মার কল্পনারও অতীত। কিন্তু বিন্দুর নিবিড় আলিঙ্গন পদ্মাকে তন্মুহূর্ত্তেই বুঝাইয়া দিল যে ইহা স্বপ্ন নহে, মায়া নহে! সত্যই বিন্দু আসিয়াছে!

তারপর প্রত্যহ চুণী কাছারী চলিয়া গেলে, দুপুরে বিন্দু আসিত; প্রথমেই বিন্দু পদ্মাকে স্বীকার করাইয়া লইয়াছিল, সে যে আসে তাহা পদ্ম। চুণীর কাছে বিন্দুর সম্মতি না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারিবে না। বিস্মিতা পদ্মা, কারণ খুঁজিয়া না পাইলেও বিন্দুর আগ্রহাতিশয্যে স্বীকৃতা হইল।

কিন্তু সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ইঙ্গিতে চলে, তিনি বিন্দুর এই

সাবধানতার মধ্যেও একটা ফাঁক রাখিয়া দিয়াছিলেন। এবং সেই ফাঁকটার মধ্য দিয়া অদৃষ্ট একদিন যে মূর্ত্তিতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখা দিল, সে মূর্ত্তি দেখিয়া বিন্দু মনে করিল তাহারই বুদ্ধি ও বিবেচনার ত্রুটিতে এমনটা ঘটিল।

সেদিন একজন রাজপুরুষের পরলোক প্রয়াণ উপলক্ষে সরকারী আফিস আদালত বন্ধ হইয়া গেল। চুণী কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়া পদ্মার সঙ্গে সেই কথারই আলোচনা করিতেছিল। কখন দুয়ারে বিন্দুর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, অন্যমনস্কা পদ্মা তাহা জানিল না। অন্যদিনের মতই পরম নিশ্চিন্তমনে বিন্দু সিঁড়ি অতিবাহন করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। পদ্মার ঘরের দুয়ারটা ঈষৎ উন্মুক্ত রহিয়াছে; পরদা এক হাতে সরাইয়া কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে সহাস্য মুখে বিন্দু ডাকিল, "পদ্মা,"—

স্বামীর বাহুমূলে মাথা রাখিয়া পদ্মা কথা শুনিতেছিল। বিন্দুর আহ্বান শুনিয়া চকিতা পদ্মা উঠিয়া দাঁড়াইল। চুণী দুয়ারের দিকে চাহিল।

চুণী দেখিল, মৃদুস্মিতাননা নারী কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল, তাহার দিকে চাহিয়াই সেই নারীর স্মিতহাস্য নিভিয়া গিয়াছে; কে যেন চকিত হস্তে সেই চারু নারী-প্রতিমার মুখপঙ্কজের অপূর্ব্ব বর্ণসুষমার উপর নিবিড় কালিমা লেপন করিয়া দিয়াছে। ব্যাধ-তাড়িতা অসহায়া কুরঙ্গিণীর মতই বিন্দু, দুই হাতে পরদা সরাইয়া ফেলিয়া দুয়ার ঠেলিয়া সিঁড়ির দিকে দ্রুত কম্পিত চরণে নামিয়া আসিল।

পদ্মা একটা অস্ফুটশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, দারুণ উত্তেজনায় চুনীর চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিকরূপে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং সমস্ত মুখখানা, মরণাহতের মুখের মতই রক্তহীন হইয়া গিয়াছে।

বিস্মিতা পদ্মার বাহুবেষ্টনীর মধ্যে আশ্রয় পাইবার পূর্ব্বেই চুনীর মূর্চ্ছাতুর দেহ পর্যাঙ্কের উপর লুটাইয়া পড়িল !

বিন্দুর কাছে সমস্ত কথা শুনিয়া ষোড়শী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, "দেখ্ বোঠান, আমার মনে হয় তোর দুঃখের দিন কেটে এসেছে, এবার তোর ম্লান মুখে হাসি ফুটবেই, নইলে কখনই এমনটা ঘট্‌ত না ; তোর মত সতী লক্ষ্মী সারা জীবনটাই কষ্ট পেয়ে যাবে, এমন অবিচার হতেই পারে না।"

বিন্দু একটু হাসিয়া কহিল,—"যেহেতু তোমার গরজ কিছু বেশী,—এই ত ?" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিন্দু কিছুক্ষণ বাহিরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল ; তারপর ধীরে ধীরে কহিল,—"ঐ কামিনী ফুলের দলগুলি দেখ্‌ছিস্ ?—গাছ থেকে ঝরে পড়েছে ? ও ঝরা দলগুলি কুড়িয়ে গাছে লাগিয়ে দেওয়া চলে কি ? ঐ দলগুলি শুকিয়ে ম্লান হয়েছে, কিন্তু চেয়ে দেখ্, ঠাকুরঝি, গাছ ছেয়ে নূতন ফুল ফুটেছে ! তোরা ঝরা দল্‌গুলির জন্য কোনও বিচারের আবশ্যক আছে বলে মনে করিস্ কি ?"—

ষোড়শী কহিল, "দেখ্ তোর এ সব কথার উত্তর যে একেবারে না দেওয়া যায় এমন নয়। মানুষগুলি একেবারে পশুই সব সময়ে থাকে না এবং মাঝে মাঝে ঝরা ফুল কুড়িয়ে আদর করে তুলে নেয়

এমনও ত দেখা যায়। যখন তুই মরণ কামনা করে পুরী যাচ্ছিলি, সেই শেষ মুহূর্ত্তে, খোকাকে দেখিয়ে যিনি তোকে এখানে টেনে আন্‌তে পেরেছেন, মনে হয়, তিনি বুঝি সবই কর্ত্তে পারেন।"—

ষোড়শীর কথা শুনিয়া বিন্দু এবার আর হাসিল না, অশ্রুজড়িত-কণ্ঠে কহিল, "আমি শুধু ছেলে দেখ্‌তেই এসেছি ঠাকুরঝি! আর কিছু কামনা আমি করি নাই, নারী বুদ্ধি নিয়ে বুঝ্‌তে পারিনি, যে নিজেকে লুকিয়ে রাখা যতটা সহজ ভেবেছিলাম, ঠিক ততটা সহজ নয়। ধরা পড়্‌লে যে একটা অনর্থ ঘট্‌বে, এ হিসাব কর্ত্তে পারিনি! মা হয়েছি, তখন সেই গর্ব্বেই আমার বুক ভরে উঠে-ছিল;—এ যে কি এক নূতনতর স্পন্দন, অনুভূতি বুকের মধ্যে জেগে উঠেছে, তা' ঠাকুরঝি তোকে বুঝাতে পার্‌ব না!—ছেলের মা হতে পারি, কিন্তু সংসার ত ছেলের নয়, সেখানে আমার কি দাবী আছে?—কিছু না! ছেলে মানুষ হয়ে উঠুক, সে যদি আমার দাবী, আমার অধিকার না বোঝে, তবুও তার কাছে এসে আমি অসঙ্কোচে দাঁড়াতে পার্‌ব। কিন্তু যিনি আমাকে আমার সকল অধিকার থেকে বিচ্যুত করেছেন, আমার অপমান হলে সেটা যে তাঁরই গায়ে বাধ্‌বে, এটুকুও যিনি বিবেচনা করেন নি,—তাঁর কাছে আর কখনই আমি দাঁড়াব না! তাতে মনে হয়, স্ত্রীজাতি-টারই অপমান করা হবে।"—

—"তা' তিনিই যদি তোকে ডাকেন!"

—"না, তা' হলেও না! আর সে ডাক্‌বার পথ ত তিনি নিজেই রুদ্ধ করে দিয়েছেন!"—

ষোড়শী তাহার বিশাল চক্ষু দুইটি একটু কুঞ্চিত করিয়া বিন্দুর মুখের দিকে একবার তীব্র কটাক্ষে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে তাহার ভূলুণ্ঠিত অঞ্চলখানি তুলিয়া লইতে লইতে কহিল,—"কেন, পদ্মাকে এনেছেন বলেই কি তোকে ডাক্‌বার অধিকার হারালেন?"—বিন্দু ব্যথিত স্বরে কহিল, "না ঠাকুরঝি! একটা দাসীর অধিকার দিয়েও আমাকে তাঁর সংসারের এক কোণে ফেলে রেখে যদি তিনি সহস্র পদ্মা ঘরে আন্‌তেন, সত্যি বল্‌ছি ঠাকুরঝি, তা হলেও আমার এতটুকু ক্ষোভও থাক্‌ত না! কিন্তু আমার সম্মান রক্ষার ভার ত তাঁর উপরেই, তাঁর সংসারের বাইরে যে আশ্রয়েই, যত আদরেই থাকি না কেন, সে আশ্রয় ত আমাকে সম্মান দিতে পারে না, আমাকে অপমান থেকে রক্ষা কর্‌তে পারে না! তিনি যদি আমার মান অপমান একবারটিও হিসাব করে না দেখ্‌লেন,"—বিন্দুর স্বর গাঢ় হইয়া আসিল, দুই চক্ষু অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; সে তাহার অশ্রুপরিপ্লুত চক্ষু দুইটি একবার অঞ্চলে মার্জ্জনা করিল, তারপর দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া ক্রন্দনের বেগটাকে রোধ করিবার চেষ্টা করিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল। ষোড়শী তাহার দুই বাহু দ্বারা বিন্দুর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল। বিন্দু ষোড়শীর স্নেহপূর্ণ বক্ষে আশ্রয় পাইয়া কিছুক্ষণ কাঁদিয়া বুকের ভারটা লাঘব করিতে চাহিল। ষোড়শীর চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। বিন্দু বিন্দু অশ্রু তাহার কপোল বাহিয়া নামিয়া আসিয়া বিন্দুর চুলের রাশির মধ্যে আশ্রয় লইতেছিল।

ষোড়শী কহিল, "ওঠ্ বৌঠান্, চোখের জলে সত্যিই যখন দুঃখের আগুন নেভে না, তখন কেঁদে ফল কি ? যা ঠাকুর কর্ব্বেন, তাই হবে ; ভেবে কিছু ফল আছে মনে হয় না !—ওঠ্, তোর চুলগুলি ভারি রুখু হয়ে গেছে, আয় বেঁধে দি'।"

বিন্দু সে কথায় কাণ না দিয়া কহিল,—"যে আগুন নিভাতে জানে না, শুধু জ্বাল্‌তেই জানে, সে যে একটা মস্ত অভিশাপ ! তা'কে দূরে সরে যেতেই হবে ! তুই আমাকে পুরীই পাঠিয়ে দে, ঠাকুরঝি।"—

ষোড়শী ধীরে ধীরে কহিল, "তা তিনি ডাক্‌বেন না এটা যদি নিশ্চিত বুঝে থাকিস্, তা'হলে তুই অত ভয় পাচ্ছিস্ কেন,—আর এত ব্যস্তই বা হয়ে উঠেছিস্ কেন ?"

বিন্দু উদ্বেগকম্পিতকণ্ঠে কহিল, "তিনি ডাক্‌বেন না সত্যি, কিন্তু আমি পক্ষকাল পদ্মার সঙ্গে থেকে তাকে যদি একটুও চিনে থাকি, তা'হলে আমি ঠিক্ বল্‌ছি, যে মুহূর্ত্তে, পদ্মা সব জান্‌তে পার্‌বে, সে ছুটে আস্‌বে ;—আমাকে ডাক্‌বে ! কিন্তু তেজস্বিনী পদ্মা তাঁকে ক্ষমা কর্‌বে না ;—অন্ততঃ ক্ষমা কর্ত্তে চাইলেও পার্‌বে না !—ঠাকুরঝি, এ আমি কি কর্‌লাম ?—কেন পদ্মার সুখের হাট ভেঙ্গে দিতে পুরী থেকে ছুটে এলাম ? এ যে কি ধিক্কার, কি জ্বালা, আমি ভোগ কর্‌ছি, তা' ত আমি বল্‌তেও পারিনে। পদ্মা এসে পড়্‌বার পূর্ব্বেই যা'তে আমি পুরী চলে যেতে পারি, তারই একটা বন্দোবস্ত কর্, লক্ষ্মী দিদিমণিটি আমার !"—

ষোড়শী তাহার বিস্ময় বিস্ফারিত বিশাল চক্ষু দুইটার নিবিড়দৃষ্টি

বিন্দুর অশ্রুম্লান মুখের উপর স্থাপন করিয়া কিছু কাল অভিভূতের মত বসিয়া রহিল। তারপর গাঢ়স্বরে কহিল,—"তোকে ভুলে যাওয়া আর তোকে না চিন্‌তে পারার চেয়ে দুর্ভাগ্য বেশী যে আর কি হতে পারে, তা' সত্যি আমি ভেবে পাই না, বিন্দু!"

বিন্দু কোন কথা কহিল না।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। একটা উদ্দাম পবন প্রবাহ কামিনী ফুলের গন্ধ বহন করিয়া আনিয়া বিন্দু ও ষোড়শীর অঞ্চল ছুঁইয়া, চূর্ণ কুন্তল উড়াইয়া কক্ষ মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছিল।

দুইটি ব্যথিতা নারী সেই বিরলান্ধকার কক্ষ মধ্যে পরস্পরের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মৌনভাবে বসিয়া রহিল।

১০

চুণী বুঝিল, এবার তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

এ দেবতার দণ্ডবিধান, এ বিধান কঠিন, অমোঘ, অপরিহার্য্য! সুতরাং এ দণ্ডকে বুক পাতিয়া গ্রহণ করা ছাড়া তাহার আর কোনও উপায়ই ছিল না!

স্বামীর অসম্বদ্ধ কথাগুলির মধ্য হইতে নিষ্ঠুর সত্যটিকে খুঁজিয়া পাইতে পদ্মার বেশীক্ষণ লাগিল না।

প্রথমে এই দারুণ সত্যটি একটি গুরুতর আঘাতের মতই পদ্মার অন্তরকে নিষ্পিষ্ট, পীড়িত করিয়া তুলিল!

আঘাতটা প্রথম পাইয়াই পদ্মার মনে হইল, বিশ্বের মুখের উপর হইতে আলোক লেখা মুছিয়া গিয়াছে! একটা কালো

যবনিকা টানিয়া দিয়া কোন্ প্রেতের অস্পষ্ট ছায়া সেখানে তাণ্ডব নৃত্য সূচিত করিয়াছে।

বিশ্বের এই নিষ্ঠুর মূর্ত্তি পদ্মা কোনও দিনই প্রত্যক্ষ করে নাই। নিবিড় নির্ভরতার মধ্যে প্রফুল্ল লতিকাটির মতই সে চুণীকে বেষ্টন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল; স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে নিজের স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়াছিল, অস্তিত্ব ভুলিয়াছিল, কিন্তু আজিকার এই অপ্রত্যাশিত আঘাত তাহাকে একেবারেই দলিত, বিধ্বস্ত, ভূলুণ্ঠিত করিয়া দিয়া গেল!

পদ্মা ঘুণাক্ষরেও বুঝে নাই, তাহার স্বামীর অন্তর মধ্যে এমন একটি নিভৃত গোপন অংশ থাকিতে পারে, যেখানে তাহার প্রবেশের অধিকার ছিল না এবং সুদীর্ঘ পাঁচটী বৎসরের সাহচর্য্যের মধ্যেও সে সেই গোপনতম অংশটিকে মুহূর্ত্তের জন্যও লক্ষ্য করিতে পারে নাই, সন্দেহ করিতে পারে নাই। মুগ্ধা পদ্মা এতদিন প্রেম-দেবতা জগন্নাথের মন্দির মধ্যে অবস্থান করিয়া, আজ হঠাৎ মন্দিরের বাহিরে অনন্ত সাগরকূলে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখানে বিশ্ববিপ্লাবী উচ্ছ্বাস, তরঙ্গ, ঝঞ্ঝা, গর্জ্জন ও বিরাট ধ্বংসের লীলা চলিতেছিল। পদ্মা এতকাল মন্দির মধ্যে অবস্থান করিয়া সে সংবাদ জানিতে পারে নাই, বুঝিতে পারে নাই!

আজ এক অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে বাস্তবের এই রুদ্র, অকরুণ মূর্ত্তিটি প্রত্যক্ষ করিয়া পদ্মা শিহরিয়া উঠিল!

স্বামীর নিকট হইতে এতকাল যাহা কিছু পাইয়াছে, সবই

আজ তাহার কাছে একটা দারুণ অপমানের বোঝার মত দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল !

পদ্মার মনে হইতেছিল, এতকাল বিন্দুকে সে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে,—বিন্দু,—এমন বিন্দু ! স্বামী তাহাকে তুচ্ছ করিয়াছেন, পায়ে দলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, তাহার জীবনটার মধ্যে একটা শুষ্ক রসশূন্য মরু রচনা করিয়াছেন ! —তাহার নারীজীবনটাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন !

কেন ? বিন্দুও ত একদিন পদ্মার মতই স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ফুটিয়া উঠিতে প্রয়াস পাইয়াছিল ;—স্বামী তাহাকে ফুটিবার অবসরটুকুও প্রদান করেন নাই ! ফুটিবার পূর্ব্বেই কুঁড়িটাকে নখরছিন্ন করিয়া পথের ধূলায় ফেলিয়া দিয়াছেন !

পদ্মার কেবলই মনে হইতেছিল, বিন্দুর কাছে সে যেন কতই অপরাধিনী ! সে বিন্দুর চিরন্তন অধিকারকে সংহরণ করিয়াছে, —সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া তাহাকে একান্তই দীন, রিক্ত করিয়া দিয়াছে !

বিন্দুর এই দীনতা শুধু একজনই দূর করিতে পারে, এই রিক্ততা শুধু একজনই পূর্ণ করিয়া দিতে পারে,—কিন্তু সে একজন হইতেও বিন্দুকে পদ্মাই যে এতকাল বঞ্চিতা করিয়া রাখিয়াছে !

একটা দুঃখ সব চেয়ে তীব্রভাবে পদ্মার বুকে বাজিতেছিল !

সুদীর্ঘ পাঁচবৎসরের সহবাসেও কি স্বামী পদ্মাকে চিনিতে পারেন নাই ?

সে তাহার অন্তরের কোনও অংশই ত স্বামীর কাছে গোপন রাখে নাই ; তবে কেন তিনি এমন করিয়া ঘুণাক্ষরেও তাহাকে এ কথাটা জানিতে দিলেন না ? আজ সে যখন দৈবের নিষ্ঠুর সঙ্কেতে কথাটা জানিতে পারিল, তখন আর এমন একটু অবসরও রহিল না, যে সে বিন্দুর কাছে ক্ষমা চাহিয়া লইবে! —বিন্দুকে ধরিয়া আনিয়া তাহার ন্যায্য অধিকারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা করিয়া দিবে!

আজ শুধু লজ্জা, ধিক্কার ও দুঃসহ অপমানের বেদনাই তাহাকে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে! কি এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ? কেমন করিয়া সে বিন্দুকে বুঝাইবে, যে, সে কিছুই জানিত না। হায়, যদি প্রাণ দিয়াও তাহাকে বুঝান যাইত!

—কিন্তু বুঝান যাউক আর নাই যাউক, তাহাকে ঐ বিন্দুর কাছে যাইতেই হইবে!

—বিন্দু,—কাঙ্গালিনী বিন্দু,—হৃতসর্ব্বস্বা বিন্দু! আহা, কি অসহনীয় দুঃখেই তাহার জীবন কাটিয়াছে!

দুইহাতে মুখের উপর হইতে উচ্ছৃঙ্খল কুন্তলরাজি সরাইয়া, ভূশয্যা ছাড়িয়া পদ্মা উঠিয়া বসিল! চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, কিন্তু ঈষৎ স্ফীত হইয়াছে ; কপোলের বর্ণসুষমা ম্লান হইয়াছে!

মুহূর্ত্ত চিন্তার পর পদ্মা ছেলেটিকে টানিয়া আনিয়া কোলে তুলিয়া লইল, তারপর দৃঢ়পদে সিঁড়ির ধাপগুলি অতিবাহন করিয়া নীচে নামিয়া আসিল। সে যখন বাড়ীর গাড়ীতে উঠিয়া

বসিল, তখন পশ্চিমাকাশে যেখানে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল, সেখানে খণ্ড লঘু মেঘের গায়ে বিচিত্র বর্ণসমাবেশ চলিতেছিল !

চঞ্চলপদে ষোড়শীর ঘরে প্রবেশ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে পদ্মা কহিল, "আমার দিদি বিন্দু কোথায় ?"—ষোড়শী এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। জানালার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া চকিত দৃষ্টিতে সে পদ্মার দিকে চাহিল !

ছেলে কোলে লইয়াই পদ্মা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, আশা করিয়াছিল ষোড়শীর সঙ্গেই বিন্দুকে দেখিবে ; না দেখিয়া একটু শঙ্কিত হইয়া পড়িল !

ষোড়শী ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল ! পদ্মার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না ! পদ্মা উদ্বেগচঞ্চল দৃষ্টিতে ষোড়শীর মুখের দিকে চাহিল এবং নিতান্ত অসহায়ভাবে কোল হইতে ছেলে নামাইয়া দিতে দিতে আবার কহিল,—"বিন্দু কোথায়,—বিন্দু ?—"

ষোড়শী পদ্মার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল, তারপর মৃদুস্বরে কহিল, "বিন্দু ত পুরী চলে গেছে—"

পদ্মা কাতর দৃষ্টিতে ষোড়শীর মুখের দিকে চাহিল ; দেখিল, সেই মুখখানি সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ !—করুণায় উচ্ছ্বসিত !

পদ্মা বুঝিল, এ মুখ যাহার, সে অন্যের দুঃখ বুঝে ; ইহার কাছে এত দুঃখের মধ্যেও অসঙ্কোচে আসিয়া দাঁড়ান যায়। এবং আবশ্যক হইলে কথা বলিয়া হৃদয়ের গুরুভারটাকেও বুঝি একটু লাঘব করা চলে !

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল! তারপর অশ্রুজড়িত কণ্ঠে পদ্মা কহিল, "সহস্র অপরাধের ছাপ নিয়েই যখন প্রথম তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, তখন আমার পক্ষে লজ্জা করাটা কোন মতেই আর শোভা পায় না! তোমার মুখ দেখে আমার মনে হচ্ছে, তুমি আমার ব্যথা বুঝ্বে এবং তাই বুঝেই আমাকে যতটুকু অধিকার স্বচ্ছন্দে দিতে পার, তাই দেবে!"

পদ্মা চুপ করিল,—একবার তাহার ম্লানদৃষ্টি উৎসারিত করিয়া ষোড়শীর মুখের দিকে চাহিল!

ষোড়শী কোনও কথা না কহিয়া দুইহাতে পদ্মার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাহার সমস্ত দ্বিধা ও সংশয়ের মীমাংসা করিয়া দিল!

অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে পদ্মা কহিল, "না, এত সহজে তুমি আমাকে ক্ষমা কর্লে আমার এ গুরু অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে না! আজ যে দুঃসহ গ্লানিতে আমার বুক ভরে উঠেছে, তাকে নষ্ট কর্তে হলে, যারা আপনার জন, তাদের কাছ থেকে আঘাত ও অনাদর আমাকে পেতেই হবে!"

"তোমার অপরাধ ত কিছু নাই; যাকে নিয়ে এত ব্যাপার, সেই নিজেকে অপরাধী মনে করে ছুটে পালিয়েছে; তোমার অপরাধ আছে ঘুণাক্ষরেও মনে কর্ত্তে পারেনি ত!"

"আমি তার সর্ব্বস্ব হরণ করেছি, তার নারীজীবনকে ব্যর্থ করেছি,—তবে জান্তাম না, কিন্তু করেছি ত সত্যি,—এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত যে আমাকে কর্ত্তেই হবে! সে পালিয়ে গেলে চল্বে না,—তাকে যেমন করেই হ'ক্ চাই-ই!"

—"না পদ্মা, তাকে পাওয়া বুঝি খুব সহজ হবে না, সে মর্‌তে চেয়েছিল, গাড়ীতে তোমার কোলে ছেলে দেখে তার বাঁচ্‌তে সাধ গেল, ছেলের মায়ায়—সে পুরী ছেড়ে, মরণ ফেলে এখানেও ছুটে এল। মা হয়েছে, এই গর্ব্বেই তখন তার বুক ভরে উঠেছিল; ভেবেছিল, কেউ তাকে জান্‌বে না; পদ্মার সখী রূপেই ছেলে বুকে নিয়ে নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধ মিটিয়ে নেবে; তারপর ধরা পড়ে সে বুঝ্‌ল যে তার হিসাবে একটু ভুল হয়ে গেছে;—ধরা পড়্‌লে যে পদ্মার সুখের সংসার ভেঙ্গে যাবে, তা' সে আগে হিসাব কর্ত্তে পারে নি"—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ষোড়শী গাঢ়স্বরে কহিল, "ধরা পড়ে সে যে কি গ্লানি, কি ধিক্কার নিয়েই পালিয়েছে! পদ্মা—পদ্মা, তার সে কাতর মুখখানি যে আমি মনেও কর্‌তে পারি না, পদ্মা! অশ্রুপূর্ণ চোখে কতবার বলে গেল, ঠাকুরঝি, মরণ ফেলে ছেলের মায়ায় ছুটে এসে পদ্মার সাজান সংসার ভেঙ্গে গেলাম!—এ যে কি জ্বালা তা' আমি ত বল্‌তেও পারি না'!"—

ষোড়শীর দুই কপোল বাহিয়া বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু নামিতেছিল; পদ্মা অঞ্চলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে কহিল, "আমার যে কাঁদ্‌বার অধিকার আছে, তা'ও আমার মনে হয় না। কাঁদ্‌তে পার্‌লে বুঝি আমার বুকের জ্বালাটা অর্দ্ধেক কমে যেত,—কিন্তু, না এ জ্বালাটাকে আমার জাগিয়ে রাখ্‌তেই হবে,—যদি বিন্দুকে ফিরাতে পারি, তবেই কেঁদে চোখের জলে এ জ্বালা নিভা'তে চেষ্টা কর্‌ব।"

ষোড়শী কি ভাবিল, অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিয়া পদ্মার অস্বাভাবিক-রূপে উজ্জ্বল চক্ষু দুইটার দিকে একবার চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে ডাকিল, "বোঠান্"—

অপরাধীকে হঠাৎ মুক্তির আদেশ প্রদান করিলে সে যেমন গভীর বিস্ময়ে চমকিয়া উঠে, এবং সেই আদেশটাকে সত্য বলিয়া প্রথমে বিশ্বাস করিতেই চাহে না, পদ্মাও ষোড়শীর মুখে এই পরম ঈপ্সিত আহ্বানটি শুনিয়া তেমনই চমকিয়া উঠিল, এবং বিশ্বাস করিতে চাহিল না, যে, সত্যই ষোড়শী তাহাকে একেবারে পরিপূর্ণ রূপেই ক্ষমা করিয়াছে!—

পদ্মা কহিল, "তোমাকেই একবার ডাক্‌বার অধিকার পাওয়ার জন্য আমার প্রাণটা আকুল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তুমি যে সত্যই আমাকে এত শীঘ্র এমন করে ক্ষমা কর্ত্তে পার্‌বে তা' একবারটিও আশা কর্‌তে সাহস হয়নি।"

"বিন্দুর কাছে শুনেই তোর উপর আমার একটা গভীর শ্রদ্ধা হয়েছিল, কিন্তু বিন্দুকে ছাড়া আর কাউকে আমি 'বোঠান্' বলে ডেকে এমন তৃপ্তি পাব তা আমি স্বপ্নেও মনে কর্ত্তে পারি নি! এ ত তোকে অধিকার দেওয়া নয় বোঠান্, তোকে ডাক্‌বার অধিকার পেয়ে যে আমি নিজেই কৃতার্থ হয়েছি, পদ্মা!" ষোড়শী দুইহাতে পদ্মার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল।

এবার সত্যই পদ্মার চোখে জল আসিতেছিল,—সে ষোড়শীর স্কন্ধে মুখ রক্ষা করিয়া বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তারপর গাঢ়স্বরে

কহিল "শ্বশুরকুলের খবরই জান্‌তাম্‌ না, আজ তোমার ডাক শুনে মনে হচ্ছে আমার নারী জীবনের একটা দিক এতদিন একেবারেই অপূর্ণ রয়েছিল, শ্বশুরের ভিটায় প্রদীপ জ্বেলে যে স্বর্গের সন্ধান পাওয়া যায়, তা' আজ সত্যি বলেই মনে হচ্ছে! আজ আর আমি কোনো কথাই বল্‌বনা, ঠাকুরঝি, যদি বিন্দুকে ফিরাতে পারি তবেই,"—পদ্মার নিঃশ্বাস গাঢ় ও গভীর হইয়া আসিল, ওষ্ঠ দুখানি বায়ুতাড়িত বান্ধুলি পুষ্পদলের মতই কাঁপিতেছিল; সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, "ঠাকুরঝি, আমি কালই পুরী যাব,—আশীর্ব্বাদ ক'রো যেন তা'কে ফিরিয়ে আন্‌তে পারি,—তারপর তিন জনে এক সঙ্গে একদিন কেঁদে দেখ্‌ব, এ জ্বালা কমাতে পারি কি না!"—

চোখের জল মুছিতে মুছিতে ষোড়শী কহিল, "চল্‌, আমিও তোর সঙ্গে সঙ্গে যাব, পদ্মা!"

১১

পুরী ফিরিয়া আসিয়াই বিন্দু শয্যাগ্রহণ করিল। একটা নূতন অনুভূতির উদ্দাম চাঞ্চল্য এতদিন তাহাকে অস্থির, উন্মুখ করিয়া রাখিয়াছিল, দীর্ঘকালের সঞ্চিত পীড়াটাকে বাড়িয়া উঠিবার অবসর প্রদান করে নাই; আজ সে যখন তাহার অবসন্ন দেহভার শয্যার উপর ঢালিয়া দিল, তখন তাহার পীড়াটা এত দ্রুত গতিতেই বাড়িয়া চলিল যে বিন্দু নিজেও নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিল, এবার মুক্তির আদেশ আসিতেছে।

বিন্দুর বুকের মধ্যে শোণিতের উচ্ছ্বাস মধ্যে মধ্যে বড়

দ্রুততালে নাচিয়া উঠিতেছিল ; কোথায় এতটুকু বন্ধনহীন বেদনা ছিল, বিন্দু সেই বেদনাটুকুকে লুপ্ত করিয়া দিতে চাহিল !

একটা পরম [illegible]মের নিঃশ্বাসপাতের সঙ্গে সঙ্গে যদি জীবনটাকে নিঃশেষ করিয়া দেওয়া যাইত।

কোথায় বাধা ? কেন তাহা পারা যায় না ! গাঢ়তম মেঘ জীবনের দুইটি কূল ব্যাপিয়া নামিয়া আসিয়াছিল, সেই অন্ধকারের মধ্যে মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ স্ফুরণ জাগাইয়া তুলিয়া কেন সেই প্রিয় শিশুটির কোমল, তরুণ মুখখানি দেখা দিল ?

তাহার লীলা চঞ্চল গতিভঙ্গি, তাহার কোমল স্পর্শ, তাহার অঙ্গসৌরভ, তাহার আহ্বান,—মায়ের বুকের উপর দিয়া মায়া তুলিকা বুলাইয়া বুলাইয়া, কেন এই অপ্রত্যাশিত নন্দন সৃষ্টি করিয়া তুলিল !

বিন্দু ভাবিল, মরিতেই হইবে,—আর কেন ? এ নিষ্ফল মায়ায় লাভ কি ? তবু অন্তর বুঝিতে চাহে না কেন ? বুকের মধ্যে এ কি তীব্র দহন ! কেমন করিয়া এই দহনকে শান্ত করা যায় ? এ ব্যর্থ জীবনটা লইয়া কেন পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম ?

বিন্দু পাশ ফিরিয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল ; তারপর ফিরিয়া দুয়ারের দিকে চাহিল ! ধীরে ধীরে ডাকিল, "বৌঠান"— !

বীণা—বিজয়ের স্ত্রী, ষ্টোভে জল গরম করিতেছিল, উঠিয়া কাছে আসিয়া কহিল, "কি ঠাকুরঝি"—

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিন্দু কহিল, "একটা কথা বল্‌ব,"—

"কি ? এখন কেমন বোধ কর্‌ছ,—ঠাকুরঝি ?"

বিন্দু একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "বেশ আছি,—পূর্ণিমা কবে, বোঠান্?"—

—"পরশু, কেন? পূর্ণিমা দিয়ে কি হবে ঠাকুরঝি?"

—"সে অনেক কথা, তা শুনে কি হবে?"

—"তবু শুন্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে, বল্‌তে বাধা না থাকে,"—

—"বাধা কেন থাক্‌বে, বোঠান্?—সব কাটিয়ে উঠেছি, আর কিছুতেই আমাকে বাধা দিতে পার্‌বে না,"—বিন্দুর স্বর গভীর হইয়া আসিতেছিল!—

"—ছিঃ অমন কথা বলিস্‌নে, বিন্দু! ডাক্তার বলেছেন তুই সেরে উঠ্‌বি!"—

"উঠি,—ভাল!"—একটা মৃদু হাসিতে বিন্দুর পাণ্ডুর মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

—"যা' শুন্‌তে চাচ্ছিলি,—ছেলে বেলায় পূর্ণিমার রাতটা বড় ভাল লাগ্‌ত, ভাব্‌তাম, যদি পূর্ণিমার রাতে মর্‌তে পারি,"—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "পরশুকার এই পূর্ণিমাটা যদি আমার জীবনের শেষ পূর্ণিমা হ'ত!—"

বাধা দিয়া বীণা কহিল, "তুই যে কি বলিস্ ঠাকুরঝি!"—

বিন্দু একটু অন্যমনস্কভাবে কহিল, "অন্যায় কিছু বলিনি বোঠান্,—কিন্তু যদি পূর্ণিমার দিনই মরি, একটা সাধ হচ্ছে সেটা অপূর্ণ থেকে যাবে,"—

অশ্রুপূর্ণ চক্ষে বীণা কহিল, "কি?"—

"ষোড়শীকে একবারটি দেখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে,—তা' আজ খবর

পাঠালেও সে ত এসে পৌঁছতে পারবে না,"—বীণা বিন্দুর মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "দেখ্, যদি নিজ থেকেই এসে পড়ে"—বিন্দু তাহার শীর্ণ হাত দুখানি দিয়া সাগ্রহে বীণার হাত চাপিয়া ধরিল, কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "বোঠান্,"—

"কি ?"

"ষোড়শী তা' হলে এসেছে"—

বীণা ধীরে ধীরে কহিল, "তা যদি এসেই থাকে, তোর কাছেও আস্‌বে এখন।" বিন্দুকে হঠাৎ কোনও প্রকারে উত্তেজিত করা চিকিৎসকের নিষেধ ছিল। বীণা যথাসম্ভব সাবধানে ষোড়শীর আসার কথাটা বিন্দুর কাছে প্রকাশ করিল। তবু বিন্দুর মুখখানি একটু দীপ্ত হইয়া উঠিল, কপোলে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল। সে দুইহাতে ভর করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে গেল, বীণা তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, "ঠাকুরঝি, ক্ষেপ্‌লি নাকি ? তোর ষোড়শীর কোন অযত্ন হবে না!" বিন্দু একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, "দূর তা কেন!"—এই হাসি টুকুতে বিন্দুর উত্তেজিত ভাবটা একটু কমিল। এমন সময়ে পাশের দুয়ার খুলিয়া ষোড়শী কক্ষে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল, "এই তোর খোকাকে নে' বিন্দু, তুই ত ওকে ফেলে পালিয়ে এলি, আর আমি বেচারী পদ্মার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে মারা যাই আর কি ? যে রায় বাঘিনী সতীন্ তোর, বাপু!" যেন কোথায়ও মেঘ নাই, ঝঞ্ঝা নাই,—যেন কোথায়ও কিছুই ঘটে নাই, এমনই সহজভাবে কথা কয়টা বলিয়া ফেলিয়া ষোড়শী বিন্দুর মুখের দিকে চাহিল।

বিন্দুর পাণ্ডুর মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য একেবারেই রক্তহীন হইয়া গেল। ললাট আচ্ছন্ন করিয়া অতি দ্রুত ঘর্ম্মবিন্দুগুলি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। চক্ষু দুইটা অস্বাভাবিক রূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে একবার অসহায় দৃষ্টিতে ষোড়শীর মুখের দিকে চাহিয়া, দুইহাত বাড়াইয়া দিল; ষোড়শী বিন্দুর কোলের কাছে খোকাকে রাখিতে রাখিতে কহিল, "তুই যদি পদ্মাকে ক্ষমা না করিস্, সে ত তোর কাছে আস্তে পার্বে না, বোঠান্!" বিন্দু খোকাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া পদ্মাকে ডাকিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। অশ্রুমুখী পদ্মা আসিয়া ডাকিল,—"দিদি!"

বিন্দু তখন খোকাকে বুকের মধ্যে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে; একবার পদ্মার মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল, কোনও কথা কহিল না!

বীণা ত্রস্তহস্তে পাখা তুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

*　*　*　*

জ্যোৎস্নাপরিস্নাতা পূর্ণিমা রজনী, নির্ম্মেঘ আকাশপট নক্ষত্র-বিরল। গুণ্ঠন তুলিয়া ধরিয়া প্রকৃতিরাণী রূপের পসরা দেখাইতেছে! মানময়ীর মান ভাঙ্গিয়াছে; হাসি ফুটিয়াছে! প্রিয়তম সাগর চরণের কাছে লুঠাইতেছে; উচ্ছ্বসিত বক্ষ রহিয়া রহিয়া দুলিতেছে! সুন্দরের পুষ্পক রথখানি বিশ্বের বুকের উপর দিয়া নৃত্যচঞ্চল গতিতে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে! তাহারই রথের ছায়ায় ছায়ায় অসুন্দর ঢাকা পড়িতেছে,—লুপ্ত হইতেছে!

মৃদু আলোকিত কক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্র শুভ্র শয্যাখানির উপর বিন্দু

শায়িত রহিয়াছে! পার্শ্বে পদ্মা, বীণা, ষোড়শী ; বিন্দুর কোলের কাছে খোকা, বিন্দুর শিথিল হস্তে কোনও মতে তাহাকে আঁকড়িয়া রাখিতে চাহিতেছে!

বিন্দুর মুখের পাণ্ডুর ছায়া আরও পাণ্ডুর হইয়াছে, চক্ষু দুইটি একটু বেশী উজ্জ্বল, কিন্তু চক্ষুর নিম্নে কেহ যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। পাখার বাতাসে রুক্ষ চূর্ণকুন্তলগুলি ললাট চুম্বন করিয়া উঠিতেছিল! নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখাটির মতই বিন্দুর ঋজু দেহ-যষ্টিখানি পরিম্লান! একবার স্বপ্নাবিষ্টের দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বিন্দু ডাকিল, "বোঠান্!"—

বীণা অশ্রু মুছিয়া বিন্দুর মুখের কাছে মুখ আনিয়া উত্তর দিল "কি ঠাকুরঝি!"

"আজ পূর্ণিমা ত,ঘরের জানালা দরজাগুলি খুলে দে. বোঠান্!"

বীণা উঠিয়া দরজা জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া আসিল, বিন্দুর শয্যা জ্যোৎস্নালোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! বিন্দু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "বেশ জ্যোৎস্না,—দেখিস্—আজকার এ রাত্রিটা যেন না কাটে! তোরা কাঁদছিস্?—তোদের হাসি মুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাকে যেতে দে!"——

ষোড়শী বিন্দুর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল, "বিন্দু! বোঠান্!"—

বিন্দু উৎকর্ণ হইয়া সে আহ্বান শুনিল, কহিল—"কি!"

ষোড়শী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "তুই কি সত্যি এমনই করে ফাঁকি দিতে পার্‌বি বোঠান্?"—

"ফাঁকি কেন, ঠাকুরঝি! এর চেয়ে বেশী সুখ ত আমি কোন দিন চাইনি! বুকের কাছে ছেলে রেখে যে মর্‌তে পারে তার চেয়ে সুখী কে, ঠাকুরঝি? তারপর তোর স্নেহের স্মৃতি আমি মরলে পরেও আমার বুক থেকে যাবে না ত? দুর্দ্দিনে শ্বশুরকুলের সঙ্গে তুই ত আমার যোগ রেখেছিলি,—ঠাকুরঝি"—

"এ বুঝি তারি পুরস্কার তুই আমাকে দিতে বসেছিস্, বিন্দু?"—ষোড়শী কাঁদিয়া উঠিয়া গেল, শয্যার অদূরে মাটীর উপরেই লুটাইয়া পড়িয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল!

পুরী আসিয়া এ কয়দিন পর্য্যন্ত পদ্মা পাষাণ প্রতিমাখানির মতই রাত্রি দিন বিন্দুর শয্যা পার্শ্বেই বসিয়াছিল। তাহার চক্ষে অশ্রু ছিল না; শুধু একটা মর্ম্মদাহী জ্বালা দৃষ্টির সঙ্গে বাহির হইয়া আসিতেছিল! বিন্দুর মরণাহত পাণ্ডুর মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া পদ্মার বুকের স্পন্দন যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল!

পদ্মা সুস্পষ্টস্বরে কহিল, "দিদি, যদি ক্ষমা চাওয়ার অধিকার আমাকে দিতে পার, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতাম!"—

বিন্দু তাহার দুর্ব্বল, শীর্ণ হস্তখানি বাড়াইয়া দিয়া কষ্টে পদ্মার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিল, "পদ্মা! আমি তোর সুখের হাট ভেঙ্গে দিয়েছি, তোর কাছে আমারই ক্ষমা চাওয়া কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু তোর মুখের দিকে চেয়ে আমার আর তা' সাহস হচ্ছে না! পদ্মা, তোর চোখে একটু জল দেখ্‌তে পার্‌লেও আমি বুঝি নিশ্চিন্ত হয়ে ম'ত্তে পার্ত্তাম!" বিন্দু চুপ করিল, এত গুলি কথা এক সঙ্গে

বলিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বীণা খানিকটা বেদানার রস তাহার মুখে ঢালিয়া দিল!

একটু বিশ্রামের পর জড়িত স্বরে বিন্দু কহিল, "ছেলের অযত্ন করিস্ নে, পদ্মা!—ভুলে যা, আমি যে তোর পথের উপর এসে পড়েছিলাম!" উন্মুক্ত দ্বার পথে চঞ্চলপদে কেহ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল, সকলেই সেই দিকে ফিরিয়া চাহিল!

খোকা বলিয়া উঠিল, "বাবা"!—

ফুলটিকে লতিকা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলে লতিকাটি যেমন করিয়া মৃদুভাবে কাঁপিয়া উঠে, মৃত্যুর উদ্যত স্পর্শের সম্মুখে বিন্দুর দেহলতা তেমনই করিয়া একবার কাঁপিয়া উঠিল!

একবার অস্পষ্ট জড়িতকণ্ঠে বিন্দু বুঝি ডাকিল, "ঠাকুরঝি!"—

ষোড়শী ছুটিয়া আসিয়া, বিন্দুর শয্যার উপর বসিয়া পড়িল, ক্রন্দনজড়িতস্বরে কহিল, "বৌঠান্—বিন্দু—বৌঠান্—"

উচ্ছৃঙ্খল কেশরাশি মুখের উপর হইতে দুই হাতে সরাইয়া দিয়া পদ্মা উন্মাদিনীর মতই শয্যা ছাড়িয়া দুয়ারের কাছে ছুটিয়া গেল! চুণীর হাত ধরিয়া টানিয়া তীব্রস্বরে কহিল, "এখনও বিন্দুর শেষ নিঃশ্বাস পড়েনি; এ ঘরে তোমার সঙ্গে একত্রে এসে দাঁড়াতে পারি, এমন কোনও অধিকারই তুমি রাখ নাই; চল, বাহিরে যেতেই হবে।"—

পদ্মা আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই চুণীর সংজ্ঞাশূন্য দেহ কক্ষতল চুম্বন করিল!

লক্ষ্মীর মোহর

১

"ওগো শুন্‌ছ?—ঘরে আছ?"—প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ ডাকিলেন। গৃহমধ্য হইতে একটি বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠ শুনা গেল,—"মা কলসী নিয়ে জল আন্‌তে গেলেন; তুমি ঘরে এস বাবা; খোকা যেন কেমন কর্‌ছে!"

কন্যার কথা শুনিয়া প্রৌঢ় দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই ভীতিব্যঞ্জক স্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "জল, শীগ্‌গির—জল!"—ব্রাহ্মণী ঘাট হইতে কলসী লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, স্বামীর চীৎকার শুনিয়া দ্রুতপদে আসিতে লাগিলেন; আশঙ্কায় তাঁহার শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল; পথ যেন ফুরায় না। ভরা কলসীটা নিয়া শীঘ্র চলিতে পারিতেছিলেন না,—ইচ্ছা হইতেছিল, কলসীটা পথের উপরই ফেলিয়া রাখিয়া দৌড়িয়া বাড়ী যান! কিন্তু জলই যে চাই! সুতরাং কলসী নিয়াই যথাসাধ্য দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পা দুখানি অবশ হইয়া আসিতেছিল, দেহ ভার লইয়া পা আর চলিতে চাহে না! আশঙ্কায়, উদ্বেগে একবার পথের উপরই বসিয়া পড়িলেন। আবার স্বামীর বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনা গেল,—"ওরে বাছা আমার কেমন

হ'য়ে পড়্‌ল! হায়, হায়, একটু জলও মাথায় দিতে পার্‌লাম না। ও ঠাকুর, এ কি কর্‌লে!"

এই গভীর অক্ষেপোক্তি পথের উপর অবসন্ন দেহে উপবিষ্টা নারীর কর্ণে প্রাণঘাতী আর্ত্তনাদের মতই শুনাইতেছিল! আর একবার প্রাণপণ শক্তিতে কলসী টানিয়া তুলিয়া কক্ষে লইয়া রমণী ছুটিলেন, পায়ে আঘাত লাগিয়া কাটিয়া গেল, ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিল, তবু জ্ঞান হারার মতই রমণী ছুটিয়া চলিলেন।

ইতিমধ্যে কন্যাটি তাহার দুর্ব্বল দেহ লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বারান্দায় আসিল। তাহার পা টলিতেছিল, দুই হাতে ঘরের বেড়াটা চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

তাহার মাথা ঘুরিতেছিল, উঠিয়া বাহিরে আসিবার কষ্টে রোগ-ক্লিষ্ট মুখখানি একেবারে কাগজের মত সাদা হইয়া গেল! একবার অস্ফুটস্বরে 'মা' বলিয়াই সে বারান্দার উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া গেল!

ব্রাহ্মণ ঘরের মধ্যে উন্মাদের মত ছুটাছুটি করিতেছিলেন, এবং সামান্য দু'একটা মৃৎজলপাত্র ঘরের মধ্যে যাহা ছিল, তাহাই টানা-টানি করিতেছিলেন! কিন্তু কোনও পাত্রেই এক ফোঁটা জল নাই!

খোকা তাহার ক্ষুদ্র হাত দুইখানি মুঠা করিয়া শয্যার উপর পড়িয়া রহিয়াছে,—মুখখানা একেবারে নীল হইয়া গিয়াছে, চক্ষু দুইটার তারকা উর্দ্ধে উঠিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে, পায়ের আঙ্গুলগুলি ভাঙ্গিয়া মুচড়াইয়া গিয়াছে। চক্ষু পলকশূন্য,—

জীবনের কোনও লক্ষণই যেন নাই, প্রথম দৃষ্টিতে এমনই মনে হইতেছিল।

ব্রাহ্মণী কম্পিতপদে কোনও মতে ঘরে ঢুকিতেই ব্রাহ্মণ উন্মাদের মত কলসীটা টানিয়া নিলেন, কহিলেন, "ওঃ—এত জল এখন এনেছ ; পাঁচ মিনিট আগে এক গণ্ডূষ জল পেলেও বুঝি বাছাকে রাখ্‌তে পার্‌তাম ;—"একটা মাটির ভাঁড় টানিয়া আনিয়া তাহার মধ্যে খানিকটা জল ঢালিয়া লইয়া খোকার চোখে মুখে তিনি ঝাপ্‌টা দিতে লাগিলেন! প্রায় পনের মিনিট কাটিল! মনে হইল, মুখের নীলিমাটা একটু কাটিয়াছে। খানিক পরে খোকা চক্ষু বুজিয়া একটু কাঁদিয়া উঠিল! ব্রাহ্মণী তাহাকে কোলে টানিয়া তুলিতে গেলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "এখন উঠাইও না, মাথায় ন্যাকড়া ভিজাইয়া জল দাও, বাতাস কর।"

ব্রাহ্মণী কহিলেন, "বালিসটা ভিজিয়া গিয়াছে, আমি বদ্‌লাইয়া দি'!"

কন্যার বিছানায় একটা বালিস ছিল, তাহাই আনিবার জন্য ব্রাহ্মণী উঠিলেন! ফিরিতেই বিছানার দিকে দৃষ্টি পড়িল ; একটা অস্ফুট ধ্বনি মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "ওমা, মেয়ে কোথায় গেল? যে একুশ দিন পর্য্যন্ত জ্বরে শয্যাগত, যাহাকে পাশ ফিরাইয়া দিতে হয়, সে কোথায় গেল?"—

"সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমি যখন জল চাচ্ছিলাম, তখন তো খুকি উঠে গিয়েছিল, দেখ, কোথায় গেল!"—ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণ উভয়েই সত্রাসে ছেলে ফেলিয়া বাহিরে বারান্দায় আসিলেন। এক পাশে

খুকীর অসাড় দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণী তাহাকে টানিয়া কোলে তুলিলেন! তাহার সর্ব্বশরীর হিম হইয়া গিয়াছে! মাথাটি কোলের উপর হইতে গড়াইয়া পড়িল; ব্রাহ্মণী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "ওগো, আমার খুকী বুঝি ফাঁকি দিয়েছে গো! ওমা কালী, এ তুমি কি কর্লে! ও খুকী,—ওরে যাদু আমার! ওগো খুকীকে দেখ একবার!—ওরে মণি আমার,—যাদু আমার!"

ব্রাহ্মণ দৌড়িয়া আসিয়া একবার খুকীর গায়ে মাথায় হাত দিলেন! ঘাড়ের পাশে, বুকের কাছে বুঝি একটু উত্তাপ আছে! ঘরে ঢুকিয়া জলের কলসীটা টানিয়া আনিলেন, এবং খানিকটা জল কলসী হইতেই খুকীর চোখে মুখে ঢালিয়া দিলেন! আর একবার বুকে পিঠে হাত দিয়া, কলসীটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "সবই যাবে,—কেউ রক্ষে পাবে না! ওরে খুকী, তুই তোর ভাইটির জন্য জল নিতে এসে প্রাণ দিলি, তা ত আমি বুঝিনি! এত বেলা হয়ে গেছে, তোকে যে এখনও পথ্যটুকু দিতে পারি নাই, খুকী!"—ব্রাহ্মণ দুই হাতে মুঠা করিয়া চুল ছিঁড়িতে লাগিলেন!

ব্রাহ্মণী কন্যার মরণাহত পাণ্ডুর মুখখানির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "ও খুকু, যাদু আমার, তোকে উপবাসী বিদায় দিলাম! তুই যে জল চেয়েছিলি;—আমি কলসী ভরে জল এনেছি, তোর মুখে যে এক ফোঁটাও দিতে পারলাম না,—ও খুকু,—মণি আমার,—যাদু আমার!"—

ক্রন্দনের শব্দে কয়েকজন প্রতিবেশী স্ত্রী-পুরুষ দৌড়িয়া আসি-

লেন। একজন প্রতিবেশিনী ঘরের মধ্যে খোকার কাছে যাইয়া বসিলেন, তাহার মাথায় জল দিয়া পাথার বাতাস করিতে লাগিলেন, দু'একজন ব্রাহ্মণীর কাছে বসিয়া তাঁহাকে সময়োচিত প্রবোধ দিতে লাগিলেন। পুরুষেরা তৎকালীন যথাকর্ত্তব্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

পল্লীগ্রামগুলিতে বিপদে আপদে পরস্পরের জন্য এ সহানুভূতি এখনও দেখা যায়। গ্রামবাসীরা অর্থহীন, নিঃসম্বল হইয়াছে সত্য, কিন্তু একেবারে হৃদয়হীন আজিও হয় নাই।

২

ঘটনাস্থল যশোহর জিলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম।

গ্রামখানি পূর্ব্বে সমৃদ্ধ ছিল। এখনও জঙ্গলাবৃত মন্দির ও ভগ্ন ইষ্টকালয়গুলি সেই অতীত সমৃদ্ধির স্মৃতি নীরবে বহন করিতেছে! গ্রামের দীর্ঘিকাগুলি সংস্কারাভাবে মজিয়া গিয়াছে! সমস্ত গ্রামটাই জঙ্গলাবৃত! ম্যালেরিয়াতে গ্রাম বিধ্বস্ত প্রায়; কতক মরিয়াছে, কতক ছাড়িয়া গিয়াছে! পৈতৃক ভিটার মায়া না কাটাইতে পারিয়া, অথবা উপায়ান্তর নাই বলিয়া যাহারা আছে, সংবৎসর তাহারা জ্বরে ভোগে। কাহারও মনে স্ফূর্ত্তি নাই, শরীরে শক্তি নাই, বুকে বল নাই! কবে পারে যাওয়ার ডাক পড়িবে, শুধু যেন সেই অপেক্ষায়ই সব বসিয়া রহিয়াছে! গ্রাম সুচিকিৎসকশূন্য; কেহ রোগে পড়িলে তাহার ভাল চিকিৎসা হয় না। একজন ডাক্তার আছেন, তিনি কোনও ইংরাজি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর নামকাটা সিপাহী; কিছু ঔষধ কিনিয়া আনিয়া, একটা ভাঙ্গা

আলমারী সাজাইয়া ডাক্তার হইয়াছেন। পাঁচ মাইল দূরে মহকুমা, সেখানে হইতে কবিরাজ ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসা করান ব্যয়-সাধ্য। কাহারও সামর্থ্যেও কুলায় না ; একমাত্র ভরসা দীনু ডাক্তার। সুতরাং দীনুর মান উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। পার্শ্বের তিন চারিখানি সমান অবস্থাপন্ন গ্রামেও দীনুর পসার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। সব গ্রামেই একই রোগ, ম্যালেরিয়া,—দুই তিন বৎসর অন্তর এক একবার কলেরাও ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া হাহাকার জাগাইয়া তোলে ; যাহারা জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া কোনও মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহারা কলেরার প্রকোপে মারা পড়ে।

গ্রামে পানীয় জলের একান্ত অভাব। পুরাতন দীর্ঘিকাগুলির খাত বুজিয়া জঙ্গলে ঢাকিয়াছে ; সেখানে হিংস্র জন্তরা স্থায়ীভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। গৃহস্থের বাড়ীর কুকুরটা, বাছুরটা, ছাগলটা, হাঁসটা, সময়ে অসময়ে টানিয়া লইয়া যায়। ফাঁকে পাইলে বড় গরু বলদটাও মারে। মধ্যে মধ্যে মানুষকেও আঁচড় কামড় দিতে ছাড়ে না। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একজন গ্রামবাসীকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। সেই হইতে বিশেষ জরুরি কাজ ছাড়া কেহ সন্ধ্যার পর ঘর হইতে বাহির হইতে চাহে না। দুদণ্ড রাত্রির পরই গ্রামখানি নীরব নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে—মানুষের সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না।

গ্রামের মধ্যে একটা পুকুরে কিছু জল থাকে ; বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহাও প্রায় প্রতি বৎসরই শুকাইয়া যায়,—তখন এক মাইল

দূরে "মরা ভৈরবের" জল ছাড়া আর উপায় থাকে না। গ্রামবাসী এমন অবস্থাপন্ন কেহই নহে যে একাই একটা পুকুর কাটিতে পারে। যে কয় ঘর গৃহস্থ আছে, তাহাদের সমবেত চেষ্টাতেও একটা পুকুর কাটিবার ব্যয়নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। সুতরাং চিরদিনই জলের কষ্ট, জলের জন্য দারুণ হাহাকার লাগিয়াই আছে। জলের খরচ বিশেষ হিসাব করিয়াই করিতে হয়। কিন্তু এত কষ্ট করিয়াও যে পানীয় জল সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা অপেয়, দুর্গন্ধযুক্ত; তবে জলের দুর্গন্ধ গ্রামবাসীর সহিয়া গিয়াছে, এই যা' ভরসা!

বর্ষায় খানাডোবায় জল দাঁড়ায়, বনজঙ্গল পচিয়া গ্রামে তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠে; ফলে, বর্ষার আরম্ভ হইতেই জ্বরে প্রত্যেক বাড়ী এক একটি হাঁসপাতালে পরিণত হয়। ফাল্গুনের শেষ পর্য্যন্ত জ্বরের প্রকোপ প্রবল বেগে চলিতে থাকে, শীতের মাঝামাঝি কলেরা ও রক্তামাশয় দেখা দেয়, এবং বর্ষার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই দুই কালরোগ, গ্রামের দুর্ভাগ্য লোকগুলির জীবনী শক্তি কতটুকু, তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখে। এ প্রকার গ্রাম যশোহর জেলায় কেন, সমগ্র বাঙ্গলায়, একটি দুটি নহে, শত সহস্র!

হরিহর চট্টোপাধ্যায় স্ত্রী, একটি কন্যা ও একটি পুত্র লইয়া এই গ্রামে বাস করেন। যে ভিটায় পিতৃপিতামহের পদধূলি সঞ্চিত থাকে, সে ভিটার মায়া কাটান সহজ নহে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও কাটাইতে পারেন নাই। এক সময়ে চট্টোপাধ্যায় বংশ আর্থিক অবস্থায় এমন হীন ছিল না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের সকল ক্রিয়া-

কলাপই এই পরিবারে অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু সে দিন গিয়াছে, অকাল মৃত্যুতে বৃহৎ পরিবার জনশূন্য হইয়াছে; কালের পরিবর্ত্তনে আর্থিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়াছে। বাড়ীর বড় বড় ঘরগুলি লোপ পাইয়া, সেখানে দু'খানি ছোট ঘর উঠিয়াছে। বংশের জনতা কমিয়া কমিয়া এক হরিহর চাটুয্যেতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হরিহরের একটি আট বৎসরের কন্যা ও চারিবৎসরের পুত্র। কন্যাটি চলিয়া গেল, রহিল শুধু চারি বৎসরের শিশু পুত্রটি, বংশের একমাত্র দুলাল। সেও নিত্যরোগী, জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া কঙ্কালসার, কখন কি হয় স্থির নাই। রোগীর পথ্যের জন্য খরচ বেশী লাগে। অর্থ-সঙ্গতিহীন পিতা, পুত্রের উপযুক্ত পথ্য ত দিতেই পারিতেন না, কোনও দিন সময় মত সাগু বার্লি টুকুও জুটাইতে পারিতেন না। কিছু জমাজমি যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা হইতে তিন চারি জনের সম্বৎসর চলিতে পারে এমন ধান্য পাওয়া যাইত, বাড়ীর আম, সুপারি, নারিকেল, কাঁঠাল, বিক্রয় করিয়া কোনও প্রকারে ভাতের উপরে কাপড়ের সংস্থান হইত, এবং দুই একটা অত্যাবশ্যক খরচ চলিত। কিন্তু গত দুই বৎসর অজন্মা হওয়ায় অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। গ্রাসাচ্ছাদন আর চলে না, রোগীর পথ্য দিবারও সাধ্য নাই। ইতিমধ্যে খুকী বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গেল। শোকে, দুঃখে ব্রাহ্মণদম্পতি একেবারে উন্মাদের মত হইলেন।

একদিন একজন প্রতিবেশিনী সংবাদ লইতে আসিয়া দেখিলেন, খোকা বিছানার উপর জ্বরে অজ্ঞানের মত পড়িয়া রহিয়াছে!

ব্রাহ্মণ বাড়ীতে নাই, কোথায় গিয়াছেন। ব্রাহ্মণী পুত্রের শয্যা-পার্শ্বে হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিয়াছেন।

প্রতিবেশিনী দেখিয়া শুনিয়া কহিলেন, "দেখ, খুড়িমা, যে চলে গেছে তার জন্য দুঃখ ছাড়; সে ত আর ফির্‌বে না। যে আছে, তাকে যা'তে চিকিৎসাপত্র ক'রে তুল্‌তে পার, তাই কর। একবার দীনু ডাক্তারকে দেখাও না? ছেলে যে একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশে গেল,—"

"দীনু ডাক্তারকে দেখান ওঁর যে একেবারেই মত নয়, বিনু! উনি বলেন, কি দিতে কি দিয়ে সর্ব্বনাশ করে বস্‌বে! দক্ষিণ-পাড়ার মিত্তিরদের ছেলেটির একটু জ্বর হ'য়েছিল—কি ওষুধ দিল —অম্‌নি ছট্‌ফট্‌ করে মারা গেল!—"

"তা কত লোককে ত দীনু ডাক্তার ভালও কর্‌চে—ও সময়ের দোষে কেমন একটা ভুল হয়েছিল! তা তুমি না হয় মহকুমা থেকে কবিরাজ কি ডাক্তার আন!"

"অবস্থা ত' দেখ্‌ছ, পথ্যটুকু দিতে পারিনে, তা' কবিরাজ ডাক্তার কি ক'রে আন্‌ব? যে অদৃষ্ট করে এসেছি, বাছা আমার রোগে ভুগেই সারা হল, ওষুধ পথ্যটুকুও দিতে পার্‌লাম না,"— ব্রাহ্মণীর চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

বিনোদিনী কহিল, "খুড়ী, চোকের জল ফেলে আর কি কর্‌বে —ঠাকুরকে ডাক, তিনি কূল দেবেন! আর দেখ—এই বার্লির কৌটাটা ও মিশ্রী টুকু রাখ, আর এই বেদানাহ্'টা—নরেন কলি-কাতা থেকে নিয়ে এসেছিল,—"

ব্রাহ্মণী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বেঁচে থাক, মা, তোমার নরেনের সোণার দোয়াত কলম হোক",—বিনোদিনী বাহির হইয়া গেল।

কিছুকাল পরে হরিহর চাটুয্যে ঘরে প্রবেশ করিয়া রুগ্ন পুত্রের শয্যার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন,—"ওগো শুনছ, কোথাও ত কিছু জুট্‌ল না, বেলা দুপুর পর্য্যন্ত ত ঘুরে এলাম, একটি পয়সাও হাওলাত পেলাম না। গ্রামের যা অবস্থা, দিতে পারে এমন সাধ্যও বুঝি কারু নাই। ছেলেটা যে পথ্য না পেয়ে গলা শুকিয়ে মারা যাবে,—তাই ভাব্‌ছি, আজ এখন ওকে কি দেব?"

ব্রাহ্মণী বার্লির কৌটা, মিশ্রীর পুঁটুলি ও বেদানা দুইটি স্বামীর সম্মুখে রাখিলেন।

"কোথায় পেলে এ সব?"

"বিনোদিনী এসেছিল, দিয়ে গেল, নরেন কলিকাতা থেকে এসেছে, সেই এনেছে!"

ব্রাহ্মণের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল! কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাও?——"

"যাই, নরেনকে একবার বলে আসি, সে এ গুলি না পাঠালে আজ যে আমার বাছা গলাশুকিয়েই মারা যেত। তুমি ওকে কিছু খাওয়াও!—আমি এখনি ফির্‌ব!"—ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, কৌটা খুলিয়া অতি সাবধান হস্তে একটু বার্লি বাহির করিলেন। কলসী হইতে জল গড়াইতে যাইয়া

দেখিলেন একবিন্দু জলও নেই। আজ আর খোকাকে একা রাখিয়া জল আনিতে যাইতে সাহস হইল না। প্রায় সিকি মাইল দূরে পুকুর,—সেদিন ভাইটির রক্ষকরূপে খুকী ছিল; আজ ত খুকী নাই!

এতক্ষণ একটা ক্রন্দনের বদ্ধ আবেগ বুকের ভিতর গুমরিতেছিল,—এখন সেই আবেগ হৃদ্‌পিণ্ডটা মুস্‌ড়াইয়া, বুকের ভিতরটা আলোড়িত করিয়া, শ্বাসনালী নিপীড়িত করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল।

ব্রাহ্মণী মাটীতেই লুটাইয়া পড়িলেন, একবার আর্ত্তচীৎকার শুনা গেল,—"খুকু যাদু আমার,—মণি আমার! জল আন্‌তে যাব,—তুমি তোমার ভাইটির কাছে বস্‌বে এস, খুকু,"—তারপর নিজেই মুখের ভিতর অঞ্চলপ্রান্ত গুঁজিয়া দিয়া কান্নার বেগটাকে রোধ করিতে চাহিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে নরেনের মাতুলালয়ের কাছে আসিয়া বাহির হইতেই ডাকিলেন, "নরেন, নরেন!" এই আহ্বানটির মধ্যে একটা অতি করুণ ক্রন্দনের সুর প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত ছিল! নরেন বাহিরে আসিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে কহিল, "কি আপনি—এই দুপুর—বেলা!" নরেনের হাত দুইখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া ব্রাহ্মণ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "নরেন, তুমি আমার খোকাকে আজ পথ্য দিয়েছ,—আমি এত বেলা কিছুই যোগাড় করিতে পারিনি, বাছা আমার গলা শুকিয়ে মারা যেত! আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি, নরেন!"—ব্রাহ্মণ আর একটি কথাও

বলিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু ভরিয়া অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। নরেন স্তম্ভিতের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, "আপনি এই দুপুর রোদের মধ্যে কষ্ট ক'রে এসেছেন!—আপনি বাড়ী বসে আশীর্ব্বাদ কর্লেও যে তা আমি নিঃসন্দেহে পেতুম, দাদা মহাশয়!"

৩

সপ্তাহ পরে খোকার অবস্থা খুবই মন্দ দেখা গেল। ব্রাহ্মণী কহিলেন, "ওগো, একটু ওষুধ আমার বাছাকে খাওয়াতে পার্লাম না, এ দুঃখ যে আর ম'লেও আমার যাবে না!"—চোখের জল অঞ্চলে মুছিয়া ফেলিয়া ব্রাহ্মণ খোকার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মনে হইতেছিল, এমনই করিয়া হাত বুলাইয়া যদি খোকার সমস্ত রোগকষ্ট দূর করা যাইত! দেবতা কোথায় থাকিয়া এ দৃশ্য দেখিতেছেন? তিনি কি এত নিষ্ঠুর? মায়ের প্রাণের আকুল প্রার্থনা কি তাঁহার কাছে পৌঁছায় না!

ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন, কহিলেন, "তা' কেমন ক'রে হবে? দীনু ডাক্তারকে আন্তে পারি, তাও দুটি টাকার কমে হবে না। দুটা পয়সারও সঙ্গতি যে আমাদের নেই, গিন্নী!"—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া একবার গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"শোন গিন্নী!—তৈজসপত্র বল্তে ঘরে কিছুই রাখিনি; বাড়ীর বাঁশ, গাছ, সব বিক্রী করে ফেলেছি,—তা'তেই যেভাবে এবছর চল্‌ছে দেখ্‌ছ। নরেনের দেওয়া বার্লি মিশ্রীটুকু ফুরালে খোকার পথ্য চল্‌বে না! একদিন অন্তর একসন্ধ্যা এখনও

জুটছে, ক'দিন পরে তাও বন্ধ হবে! উপায় ভেবে ঠিক করতে পারিনি! এইবার বুঝি বাবার আদেশ লঙ্ঘন করতে হ'বে!"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া ব্রাহ্মণ আবার নীরব হইলেন, এবং দুই বাহু বক্ষসম্বদ্ধ করিয়া ঘরের মধ্যেই অস্থির ভাবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী ধীরভাবে কহিলেন; "ওগো, তুমি অমন কর্‌ছ কেন? একটু স্থির হ'য়ে বস। অদৃষ্টে যা আছে, তা' তো আর কেউ খণ্ডাতে পার্‌বে না! আমার মাথা খাও, একটু স্থির হও, ঠাকুরের পায়ে নির্ভর কর, যা' হবার তা হবে! অমন কর্‌লে পাগল হয়ে যাবে যে!"—

"পাগল হবার বড় দেরী আছে মনে করোনা। যাক্—যা বল্‌ছিলাম— এইবার ও লক্ষ্মীর মোহরটি বের করে দাও! বাবা বলেছিলেন, গাছতলায় থেক, তবু লক্ষ্মীর মোহরটি হাতছাড়া ক'রো না। সে কথা আর রাখ্‌তে পারি কই? গিন্নী, আমি ঠিক বুঝেছি, খোকাকেও রাখ্‌তে পার্‌ব না! খুকী আমার চলে গেল, তার মুখে জলটুকু দিতে পারিনি। খোকাও চল্‌লো,—ওর মুখে একটু ঔষধ পথ্য দিতে পার্‌লাম না! না, সে কষ্ট আর মনে রাখ্‌তে চাই না। আমি কুসুমপুরের বোসেদের বাড়ী গিয়ে ঠিক্ করে এসেছি, আমার লক্ষ্মীর মোহর রেখে তারা পঁচিশ টাকা দিতে স্বীকার হ'য়েছে! আমি একজন ভাল ডাক্তার মহকুমা থেকে নিয়ে আস্‌ব! ও যখন যাবেই, তখন অন্ততঃ এইটুকু ক'রে, একেবারে গাছতলায় বস্‌ব!"

"চুপ্ কর, চুপ্ কর, তুমি অমন করে অমঙ্গল ডেকো না!" ব্রাহ্মণী স্বামীর দুই পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন!

এমন সময়ে ক্ষীণকণ্ঠে খোকা ডাকিল, "মা,"—মা উঠিয়া যাইয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

খোকা কহিল, "মা জল,"—মা জল দিলেন; খোকা বমি করিয়া জল তুলিয়া ফেলিয়া কহিল, "মা ও জলে গন্ধ,—ভাল জল দাও!"

ব্রাহ্মণ ললাটে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "এ পাড়াগাঁয়ে বাবা ভাল জল কোথায় পাব?" খোকা আর জল চাহিল না।

পরদিন ব্রাহ্মণী "লক্ষ্মীর মোহর" বাহির করিলেন। মোহরটি একটি বহু পুরাতন সিন্দুকের কৌটার মধ্যে সযত্নে রক্ষিত ছিল। বেশ করিয়া ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিলে দেখা গেল, মোহরের একপৃষ্ঠে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতাদেবী ও হনুমানের মূর্ত্তিচতুষ্টয় অঙ্কিত, চারিপাশে ঘুরাইয়া দেবনাগরী অক্ষর; মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের নাম, কষ্টে পাঠ করা যায়। আর কয়েকটি অক্ষর বুঝা যায় না। মোহরটি হিন্দুরাজত্বের। কি ভাবে উহা চট্টোপাধ্যায় পরিবারের "লক্ষ্মীর মোহরে" পরিণত হইয়াছে, তাহা কেহ ঠিক বলিতে পারে না। চট্টোপাধ্যায় পরিবারে একটি গল্প প্রচলিত ছিল। হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের ঊর্দ্ধতন সপ্তমপুরুষ রামহরি চট্টোপাধ্যায়,—তিনি নিষ্ঠাবান্, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। উক্ত রামহরি চট্টোপাধ্যায় তীর্থভ্রমণে বাহির হয়েন। বারাণসীতে এক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; সন্ন্যাসী রামহরিকে এই মোহরটি প্রদান করেন। এই মোহর হস্তান্তরিত করিতে সন্ন্যাসীর নিষেধ ছিল। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলেও কেহ উহা হস্তান্তরিত করিতে সাহসী হন নাই! চট্টোপাধ্যায় পরিবারে যে

একটি মোহর আছে, তাহা গ্রামের অনেকেই জানিতেন, এবং গল্পটি নানা পল্লবিত আকারে পার্শ্ববর্ত্তী দুই একখানি গ্রামেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং কুসুমপুরের বোসেরা কিছু বেশী টাকা দিয়াও এই মোহরখানি হাতে আনা সঙ্গত মনে করিলেন। তাঁহারা পঁচিশ টাকার বেশী দিতে স্বীকৃত ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ বেশী টাকা নিতে চাহেন নাই। কারণ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়া মোহর পুনরায় ঘরে নেওয়াই তাঁহার মতলব ছিল, এবং কথাবার্ত্তাও সেই ভাবেই স্থির করিয়াছিলেন। বেশী টাকা নিলে শোধ করা কঠিন হইবে মনে করিয়া, বোসেরা দিতে চাহিলেও তিনি পঁচিশ টাকার বেশী নিতে রাজি হন নাই।

মোহরটি মাথায় ও বুকে ছোঁয়াইয়া ব্রাহ্মণী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "মা, দশপুরুষ তুমি ঘরে রয়েছ, আজ তোমাকে বের করে দিচ্ছি! কেন, তা' আর কেউ না বুঝুক, তুমি ত বুঝ্‌বে? তুমি আবার এস, মা,—আবার এস!"—হঠাৎ খোকা চমকিয়া উঠিয়া ডাকিল, "মা,—মা!"—

ব্রাহ্মণী মোহরটা স্বামীর হাতে গুঁজিয়া দিয়া বিছানার উপর হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িলেন, এবং খোকার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন, "কি বাবা, এই যে আমি রয়েছি!"

ব্রাহ্মণ মোহরটি হাতে লইয়া খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর দড়ির উপর হইতে উড়ুনী খানি টানিয়া লইয়া, কাঁধে ফেলিয়া, উন্মাদের মতই ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

* * * * *

সবই হইল, মহকুমা হইতে ডাক্তার আনা হইল, পথ্যাদির সুবন্দোবস্ত করা হইল। ডাক্তার লইয়া নৌকায় আসিতে হইয়াছিল, তখন সরকারী 'রিজার্ভট্যাঙ্ক' হইতে এক কলসী ভাল পানীয় জলও ব্রাহ্মণ লইয়া আসিয়াছিলেন! কিন্তু খোকা কিছুতেই রক্ষা পাইল না। ডাক্তার আসিবার তিনদিন পরেই মা বাবাকে ফাঁকি দিয়া খোকা চলিয়া গেল! তখন আকাশ ভাঙ্গিয়া মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছিল; দেবতার বজ্র চরাচর কাঁপাইয়া গর্জ্জন করিতেছিল,—এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিজলী চমকিতেছিল,—যেন আকাশের বিরাট কষ্টিপাথরের উপর এক অদৃশ্য দানব, কাঞ্চন খণ্ড দ্রুত হস্তে কষিয়া দেখিয়া আবার তেমনি দ্রুতহস্তে মুছিয়া ফেলিতেছিল!

৪

শোকে ও দুঃখে আরও সুদীর্ঘ তিনটি বৎসর কাটিয়া গেল। সংসারে কোন বন্ধনই নাই, কোনও মতে ব্রাহ্মণদম্পতির দিন কাটিতেছিল। খোকার জামাটি, পুতুলটি, খেলার গাড়ীখানি ব্রাহ্মণী সযত্নে একটা বেতের 'পেটারীর' মধ্যে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। খুকীর খেলার বাসন, পরনের ডুরে সাড়ীখানি, সবই গুছাইয়া, সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। সময়ে অসময়ে সে গুলি নামাইয়া স্বামী স্ত্রী দেখিতেন; সেগুলি বুকে চাপিয়া ধরিতেন; অশ্রুজলে জামাটি কাপড়খানি ভিজিয়া যাইত। কবে খুকি পড়সীর বাড়ী পূজা দেখিতে গিয়াছিল; সেখানে তাহারই সমবয়সী একটি মেয়ের

পরিধানে নীলাম্বরী দেখিয়া আসিয়া নীলাম্বরী চাহিয়াছিল; তাঁহারা খুকীর সে সাধ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ব্যারামের সময়ে খুকীর চুল কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল, ব্রাহ্মণী সেই চুলের গুচ্ছ-গুলি একখানা কাগজে জড়াইয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন খুকী নাই; চুলের গুচ্ছগুলিই যেন তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল। যে ক্ষুদ্র বালিস দুটি খোকাখুকী মাথায় দিত, আজ এই শোকার্ত্ত ব্রাহ্মণদম্পতীর কাছে সে দুটি আর সামান্য তুলার বালিসই নহে!— ব্রাহ্মণী প্রত্যহ বালিস দুটি, খোকার কাঁথা কয়খানি রৌদ্রে দিতেন, বাতাসে ময়লা কিছু উড়িয়া না পড়িতে পারে, কোনও মতে হারাইয়া না যায়, এজন্য সমস্ত দিনটাই দাওয়ায় বসিয়া থাকিয়া সেই কাঁথা ও বালিস দুটিকে পাহারা দিতেন! রাত্রে শয্যার পাশে খোকাখুকীর ক্ষুদ্র শয্যাখানিও সযত্নে আস্তৃত হইত! পাগলের মত ভাবিতেন, এমন দিন কি হইতেই পারে না, যেদিন প্রভাতে জাগিয়া উঠিয়াই দেখিবেন, সেই শয্যার উপর পূর্ব্বের মতই খোকাখুকী নিদ্রিত রহিয়াছে! প্রতি নূতন বৎসরের আরম্ভেই মনে হইত, সবই ফিরিয়া আইসে কিন্তু তাহারা দুইটি সেই যে চলিয়া গেল, আর আসে না কেন?

পূর্ব্বে খোকাখুকীর জন্য খুঁটিনাটি সহস্র কাজে দিন কাটিত। আষাঢ়ের খেলায়ও সময় পাওয়া যাইত না! এখন দিন আর কাটিতে চাহে না। শীতের দিনগুলিও কি দীর্ঘই হয়। হায়, সোণার দেউটী নিভিয়াছে। যাহাদের আনন্দ কলরোলে একদিন দরিদ্রের কুটীর মুখরিত হইয়াছিল, তাহারা চলিয়া গিয়াছে। যে

উজ্জ্বল দীপশিখায় ব্রাহ্মণদম্পতি তাঁহাদের জীবনের পথভাগ দেখিয়া লইবেন মনে করিয়াছিলেন, সে দীপশিখা নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এ বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যে কোন্ আলোকে তাঁহারা পথ দেখিয়া লইবেন ?

চতুর্থ বর্ষ আসিল। প্রথম উষায়, পাখীর ললিতকাকলীর মধ্যে যেমন প্রভাতের তরুণ আলোক জাগিয়া উঠে, তেমনি এই নব-বর্ষারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন অতিথির অস্ফুট কাকলীতে যখন ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র গৃহখানি মুখরিত হইয়া উঠিল, তখন জীবনের বিপুল অন্ধকারের মধ্যে, উষালোকের মতই, বেদনায় চঞ্চল, একটি ক্ষীণ আশালোক রেখা ফুটিয়া উঠিল। দেবতা, এই নবাগত অতিথিটিকে, ব্রাহ্মণদম্পতির হৃদয়ক্ষতের উপর একটি স্নিগ্ধ প্রলেপের মতই লাগাইয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণী এতদিন পর্য্যন্ত নিজের শয্যাপার্শ্বে যে ক্ষুদ্র শয্যাখানি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, এতদিনে তাহা অধিকার করিবার উপযুক্ত লোক আসিয়া পৌঁছিল।

নূতন খোকার চারিমাস বয়সের সময় ব্রাহ্মণী স্বামীকে কহিলেন, "একটা কথা বল্‌ব ?

"কি ?" ব্রাহ্মণ এক দৃষ্টিতে নূতন খোকার উবুড় হওয়ার নিষ্ফল চেষ্টাটুকু লক্ষ্য করিতেছিলেন।

—"এইবার লক্ষ্মীর মোহর ঘরে আন !"—

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমিও ক'দিন হ'তে ভাব্‌ছি !"

যে জমিজমাটুকু ছিল, তাহাতে চারি বৎসরই খুব ভাল ফসল

হইয়াছে। খোকাখুকী যাওয়ার পর হইতেই স্বামী স্ত্রী দু'জনেই দিনান্তে একবার মাত্র দুটি অন্ন মুখে দিতেন। জমিতে যে ধান পাওয়া যাইত, তাহার তিনভাগ কয় বৎসরই বিক্রয় করিয়া ফেলায়, হাতে কিছু টাকা জমিয়াছিল! ছেলে মেয়ের অসুখের সময়ে জলের অভাবটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ সঙ্কল্প করিলেন, যেমন করিয়াই হউক একটা পুকুর কাটাইবেন। নূতন খোকা আসিবার পর এই সঙ্কল্পটা আরও দৃঢ় হইল। আজ গৃহিণী যখন 'লক্ষ্মীর মোহর' ঘরে আনিবার কথা বলিলেন, তখন ব্রাহ্মণও তাহা সঙ্গতই মনে করিলেন।

পরদিনই সঞ্চিত অর্থ হইতে যথোপযুক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ কুসুমপুর চলিয়া গেলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিয়া গোপাল বসু প্রণাম করিয়া কহিল, "তারপর কি মনে করে পায়ের ধূলা দেওয়া হয়েছে,—সব কুশল ত?"

চট্টোপাধ্যায় কহিলেন, "এতদিন নানা বিপদ আপদে ছিলাম, তা ত জানই,—তাই আসতে পারিনি। সম্প্রতি আমার 'লক্ষ্মীর মোহরটি' খালাস ক'রে নেবার জন্য এসেছি,"—

গোপাল বসু গম্ভীর ভাবে তামাক টানিতে টানিতে কহিলেন, "বসুন, আমি বাড়ীর ভিতরে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি—"

"টাকাগুলি সুদে আসলে হিসাব করে এনেছি, এগুলিও নিয়ে যাও, তা হলে—"

"আহা—থাক্‌না, আমি একবার বাড়ীর ভিতর থেকে—" গোপাল, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তামাক দিতে বলিয়া চলিয়া গেল।

একজন কর্ম্মচারী ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "দেবতা কি মোহর খালাস কর্ত্তে এসেছেন ?"

"হাঁ, কেন, বল ত !"—ব্রাহ্মণ একটু অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন। গোপাল বাবুর মুখের অন্ধকার ভাবটা দেখিয়া তাঁহার কেমন একটা সন্দেহ হইয়াছিল।

"আজ্ঞে একটা কথা বল্‌তাম।"

"কি ?"

"মোহর কর্ত্তা যে দেন, এমত ত মনে হয় না।"

"কেন, বল কি ? ন্যায্য প্রাপ্য শোধ করে দেব,—আমার মোহর আমাকে দেবেন না—কেন, বল ত !"—সরলহৃদয় ব্রাহ্মণ বড়ই বিস্মিত হইতেছিলেন !

"দেখুন !"

"তা আমি ত একপয়সাও রেয়াৎ চাইব না, যে সুদ হবে সব দেব,—আমার মোহর পাব না এ কথা বল্‌ছ কেন ?"

"আজ্ঞে,—ওর মানে—একটু ব্যাপার হয়েছে।"

"কি ?" ব্রাহ্মণ উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আজ্ঞে, আপনার মোহর যে দিন ঘরে এল, সেদিনই খবর এল, যে এঁর বড় ছেলের রেলের মধ্যে বড় চাকুরী হয়েছে। আর তার পর থেকেই বিষয় আশয়েও খুব উন্নতি দেখা যাচ্ছে। খুব বড় একটা মোকর্দ্দমায় জিতে হাজার টাকার একটা সম্পত্তিও পেয়েছেন,—যদিও হাইকোর্টে মোকদ্দমার আপীল হয়েছে, সেখানেও কর্ত্তার জিতবার সম্ভাবনা—সুতরাং বুঝ্‌তেই পার্‌চেন

দেবতা—", কর্ম্মচারীটি এই পর্য্যন্ত বলিয়া চুপ করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিল!

ব্রাহ্মণ সন্দেহাকুল স্বরে কহিলেন, "তা আমার মোহর তা'তে না পাওয়ার কি হয়েছে?—এমন অধর্ম্ম"—কর্ম্মচারী চক্ষু টিপিয়া ইশারা করিল, তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, নেয়াপাতি ভুঁড়িটিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে গোপাল বসু আসিতেছেন। গোপাল অপ্রসন্ন মুখে কহিল, "আজ্ঞে, আপনার মোহরটি"—

চট্টোপাধ্যায় উদ্বিগ্নস্বরে কহিলেন, "হাঁ আমার মোহর—"

"আজ্ঞে, মোহরটি ত সেই বচ্ছরই নেওয়ার কথা ছিল, তা' মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—"

"আমি চার বচ্ছরের পুরাপুরি সুদই দিচ্ছি—"

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে, মুখ একটু বিকৃত করিয়া গোপাল কহিল,—"তা' ঠাকুর, আর কেমন করে হয়, মেয়েরা বল্‌লেন, ঠাকুর যেন অসন্তুষ্ট না হন, বরং আর কিছু টাকা—"

ঠাকুর বাধা দিয়া উত্তেজিত ভাবে কহিলেন, "গোপাল বসু, এই কি আমি তোমার শেষ কথা বলে মনে করব? এমন অধর্ম্ম সইবে কি?"

গোপালও এমনই একটা কথা চাহিতেছিল। সে রূঢ়কণ্ঠে কহিল, "ঠাকুর, শাপ গা'ল দেবেন না; কলিতে কারু ভাল কর্ত্তে নাই ত! দশটা টাকার জন্য পৈতে দিয়ে হাত জড়িয়ে ধরেছিলে, সে কথা বুঝি দিন পেয়ে ভুলে গেছ! পাঁচিশ টাকা দিয়েছিলাম।

আরও পাঁচিশ টাকা দিচ্ছি—খুসি হ'য়ে চলে যাও! কত তোমার মোহরের দাম হবে? হদ্দ বিশ টাকাই হোক্!"

অপমানে, ক্ষোভে, দুঃখে ব্রাহ্মণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "গোপাল, তুমি লোভে পড়ে আমার অন্তরে দারুণ আঘাত কর্‌ছ—এখন কোনও কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুলেই তা' তোমার পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ হবে, তাই আমি কিছু বল্‌ব না! আমি ব্রাহ্মণ সন্তান হ'য়ে জীবনে এইই প্রথম তোমার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছি; তার জন্য যথেষ্ট শাস্তি আমি পেয়েছি,—ঋণ পাপের বড় পাপ আর নেই। সুদে আসলে তোমার প্রাপ্য সিকিপয়সাটি পর্য্যন্ত এই আমি রেখে যাচ্ছি! তোমার ধর্ম্মে যা' লয়, তাই তুমি ক'রো!" একখণ্ড ন্যাকড়ার মধ্যে পুঁটুলি করিয়া বাঁধা কতকগুলি টাকা ও পয়সা গোপালের সম্মুখে ফরাসের উপর ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে রাস্তায় বাহির হইলেন। গোপাল খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মত বসিয়া থাকিয়া যখন রাস্তার দিকে চাহিল, তখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আর দেখা গেল না।

গোপালগৃহিণী দুয়ারের আড়ালে দাঁড়াইয়া সকল কথাই শুনিতেছিলেন। তিনি দুয়ার ফাঁক করিয়া চৌকাঠার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন, শঙ্কাচকিত কণ্ঠে কহিলেন, "আমার নাম ক'রে ব্রাহ্মণের সঙ্গে এ তুমি কি আচরণটা কর্‌লে? তুমি আগুন নিয়ে খেলা কর্‌চ, ভাল হবে না বল্‌ছি; এখনও ঠাকুরকে ডেকে ফিরিয়ে মোহর দিয়ে দাও—"

গোপাল একবার মুখ বিকৃত করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া

কহিল, "তোমার গরজ থাকে তুমি যাও,—বিষয় কর্ম্মের পরামর্শ গোপাল বোস্ স্ত্রীলোকের কাছে লয় না—"

গৃহিণী চোকের জল মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "দেখ, ছেলে পেলে নিয়ে সংসার কত্তে হয়, এ সব অন্যায় ধর্ম্মে সইবে না বল্‌ছি !"

গোপাল দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত করিয়া কি কহিল, বুঝা গেল না। গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

পরদিন সন্ধ্যার পর হরিহর চট্টোপাধ্যায় শয্যার উপর বসিয়াছিলেন। গৃহিণী মালসার আগুনের উপর বাটীটি রাখিয়া খোকার জন্য দুধ গরম করিতেছিলেন। 'লক্ষ্মীর মোহরটি' লইয়া যে ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল তাহাতে উভয়েরই মন অত্যন্ত খারাপ ছিল। ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিলেন, হঠাৎ গৃহিণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমি লোক ঠিক করেছি, পরশু ভাল দিন আছে, সেই দিনই পুকুর কাট্‌তে আস্‌বে, পুরাণ পুকুরটার খাত কতকটা যখন আছে, তখন শ' আড়াই টাকা হ'লেই বোধ হয় হবে,—নরেন আজ এসেছে, তাকে দিয়েই হিসেব করিয়ে দেখ্‌লাম !"

"তা' তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর।"

চট্টোপাধ্যায় ব্যথিত স্বরে কহিলেন, "আমি নূতন খোকার মুখে 'হাজিপুকুরের' পচাজল কিছুতেই দিতে পার্‌ব না ! খোকা খুকী ঐ পচাজল খেয়েই ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে চলে গেল,—সে কষ্ট আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌ব না—" উভয়ের চক্ষু অশ্রু-

সিক্ত হইয়া উঠিল! গৃহিণী একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন।

এমন সময়ে বাহির হইতে কে ডাকিল, "ঠাকুর মহাশয়,—বাড়ীতে আছেন?"

"কে?"—ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আজ্ঞে, আমি কালীচরণ দাস, দোরটা একটু খুলুন,—কথা আছে!"

ব্রাহ্মণ দীপটি হাতে করিয়া, দুয়ার খুলিয়া বাহিরে বারান্দার উপর আসিলেন, দেখিলেন, গোপাল বসুর সেই কর্ম্মচারিটি!

"কি মনে করে? ব'স,—"

"আজ্ঞে, আর বস্‌ব না, দেবতা,—আপনার মোহরটি রাখুন।"

ব্রাহ্মণ বিস্মিতভাবে কহিলেন, "সে কি, গোপাল বোসের হঠাৎ এমন সুবুদ্ধি হ'ল কেন, কালীচরণ?"

কালীচরণ গাঢ়স্বরে কহিল, "আজ্ঞে, ওদিকে যে বড় বিপদ ঘটে গেছে,—"

"সে কি, কি হয়েছে?"—ব্যস্তভাবে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আজ্ঞে, ভারি বিপদ,—আপনি আস্‌বার একঘণ্টা পরেই কলিকাতা থেকে তার এল, হাইকোর্টের মোকদ্দমায় কর্ত্তার হার হয়েছে।"

ব্রাহ্মণ কোনও কথা কহিলেন না। কালীচরণ একটু চুপ

করিয়া থাকিয়া কহিল, "আজ সকালে আর একটা তার এসেছে,—"

"কি.?"

"কর্ত্তার বড় ছেলে রেলে কাটা পড়েছেন,—"

ব্রাহ্মণ শিহরিয়া উঠিয়া দুই পা পিছাইয়া গেলেন; সভয়ে কহিলেন, "সে কি সর্ব্বনাশ, কালীচরণ!"

"আজ্ঞে হাঁ, কর্ত্তা একেবারে পাগলের মত হইয়াছেন, গিন্নীর অবস্থাও ভাল নয়,"—কালীচরণ তাহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া "লক্ষ্মীর মোহরটি" হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের সম্মুখে ধরিল,—

"এই নিন্, দেবতা, আপনার "লক্ষ্মীর মোহর!"—মোহরটি কালীচরণের হাতের উপর দীপের আলোক-প্রজ্বলিত অঙ্গার খণ্ডের মতই ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল! ব্রাহ্মণ শিহরিয়া উঠিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, মনে মনে কহিলেন, "মা, তুমি আমাকে অপরাধী ক'রে ঘরে ফিরে এলে!"

আরতি

১

চঞ্চলা মধুমতী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

কূলে কূলে কাশ-চামর দুলাইয়া মৃদু পবন ছুটিয়াছে। বাঁকের মাথায়, যেখানে ঘনবিন্যস্ত আম্রবনের মাঝে মাঝে তালনারিকেলের উচ্চশীর্ষ দেখা যাইতেছিল,—মধুমতীর সেই দক্ষিণ কূল হইতে সোপানশ্রেণীবদ্ধ ঘাট নামিয়াছে। সেই প্রস্তর বাঁধা ঘাট কোন্ অতীত যুগের সাক্ষ্য বহন করিতেছে, তাহা সে মুখ ফুটিয়া বলে না।

ঘাটের অদূরে বিগ্রহশূন্য ভগ্নমন্দির; সেই ভগ্নমন্দির মধ্যে খানিকটা ছাই আর ভস্ম, কিছু কাঠ, আর একটা ভাঙ্গা হাঁড়ি—কোন্ অতীত দিনের এক নৌকারোহী অতিথির রন্ধন আয়োজনের চিহ্ন।

মন্দিরের পাশ দিয়া গ্রামের পথ চলিয়াছে; সেই পথের পাশে পাশে দুই একটা ঝাউ, এক আধটা আম কাঁঠালের গাছ, কতকগুলি দেবদারু, পথটিকে শ্যামল ছায়াবৃত করিয়া রাখিয়াছে। অদূরে শস্যসম্পদশালী প্রান্তর ভাগ; উপরে উদার নীলাকাশ, তাহাতে ঘনমেঘের বিচিত্র লীলা!

পল্লীর লোক দল বাঁধিয়া ঘাটে আইসে, স্নান করে। বালক-

বালিকারা ঘাটে দাঁড়াইয়া মধুমতীর তরঙ্গ দেখে, আর নৌকা গণে! বধূরা অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে কৌতূহলচকিত দৃষ্টিতে খোলা মাঠ, নদীর দুকূল, আর মৃদুবায়ুকম্পিত হরিৎ ধান্যশীর্ষ দেখিয়া মধুমতীর মিঠাজলে কলসী ভরিয়া লইয়া ঘরে ফিরে!

এমনই প্রত্যহ দিন কাটে! সেদিন প্রত্যূষে পল্লীবধূরা কলসী কক্ষে জল লইতে আসিয়া দেখিল, ছাই ঠেলিয়া, কাঠ সরাইয়া, হাঁড়ি ফেলিয়া সেই ভগ্ন মন্দির কে পরিষ্কার করিয়াছে। মন্দির মার্জ্জনায় ভক্তহস্তের সেবাচিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। সবকেরা আসিয়া দেখিল, সে এক গৈরিক-পরিহিত তরুণ সন্ন্যাসী।

অঙ্গ তাহার ভস্মপ্রলিপ্ত নহে। শিরে তাহার জটাভার নাই, তবু দেবাদিদেবের মত তাহার কান্তি; প্রভাতাকণের মত অপূর্ব্ব তরুণশ্রী; ম্লান জীর্ণ মন্দির রূপের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে!

তাহার সঙ্গে ছোট একটি বীণা। ভক্তহস্তস্পর্শে সে বীণা সায়াহ্নে প্রভাতে বাজিয়া উঠে;—আর সেই তরুণ সন্ন্যাসীর মধুর কণ্ঠ নীলাকাশ প্লাবিত করিয়া ঝঙ্কৃত হইতে থাকে! বিহঙ্গ কাকলী ভুলিয়া, স্তব্ধ হইয়া সে গান শুনে; মধুমতী সে সুর শুনিবার জন্য ঘাটের পাথরের উপর আছাড়িয়া পড়ে।

সন্ন্যাসী প্রত্যহ গ্রামে প্রবেশ করে; শুধু এক বাড়ী হইতে ভিক্ষা চাহিয়া আনে!—মুষ্টিভিক্ষা!* যে গৃহস্থের বাটীতে সে ভিক্ষার জন্য যায়, সে তাহার সর্ব্বস্ব দিতে অগ্রসর হয়,—সন্ন্যাসী স্মিতমুখে মন্দিরে ফিরিয়া আইসে।

সেখানে সে তাহার পুঁথি নিয়া, বীণ্ নিয়া তন্ময় থাকে !

পুঁথি ছাড়িয়া, বীণ্ ফেলিয়া সে যখন বাহির হইতে চাহে, তখনই দেখে, পল্লীর অযাচিত সস্নেহ শ্রদ্ধার দান মন্দির দুয়ারে স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়াছে ; তখন তাহার নয়ন অশ্রুপরিপ্লুত হইয়া উঠে ; সংসারকে ছাড়িয়া সে যতই দূরে যাইতে চাহিয়াছে, সংসার তাহাকে ততই কোলের কাছে টানিয়া লইয়াছে ! তাহার অযাচিত স্নেহ দেবতার ধ্রুবদৃষ্টির মতই তাহাকে অনুসরণ করিতে চাহিয়াছে। একবার নীল আকাশের দিকে চাহিয়া মহত্ত্বের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সে দ্রুতহস্তে দুয়ারের স্তূপীকৃত উপহার রাশি চীরপরিহিত রাখাল শিশুগুলির হাতে হাতে বিলাইয়া দিয়াছে ! তাহারা বিস্মিত পুলকে এ উহার গায়ের কাছে দাঁড়াইয়া এ উহার মুখের পাশে মুখ নিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছে, দেবতার চোখের কোণে অশ্রু। অধর প্রান্তে মধুর হাসি !

২

সেদিন অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মি মধুমতীর জলের উপর তাহার মায়া তুলিকাটি বুলাইয়া দিয়া চকিতে বৃক্ষশীর্ষের উপর দিয়া কালো মেঘের আড়াল দিয়া পশ্চিমাকাশে মিলাইয়া গেল।

কিন্তু তখনও ধূসরাঞ্চলখানি উড়াইয়া সন্ধ্যাসুন্দরী নামিয়া আইসেন নাই। একটা উদ্দাম বায়ুপ্রবাহ দুরন্ত ছেলের মতই কাশগুচ্ছ দুলাইয়া, মন্দিরপার্শ্বস্থিত কুরুবকশাখা কাঁপাইয়া, ছোট নৌকার পালগুলি টানাটানি করিয়া ছুটাছুটি করিতেছিল !

ঠিক্ তখনই দুইজন ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল ! তাহাদের চূর্ণ-

কুন্তল উড়াইয়া রক্তকপোল স্পর্শ করিয়া, সংযত অঞ্চলের প্রান্তভাগ একটু দুলাইয়া বাতাস বহিতেছিল! পশ্চিমাকাশের যেখানটায় সূর্য্য ডুবিয়াছিল, সেখানে মেঘের উপরের রক্তিমাভা তখনও কাটিয়া যায় নাই, সেই বর্ণসুষমার আভা তাহাদের তরুণ মুখের উপর আসিয়া লাগিয়াছিল ; একটা উদ্দাম তুলিকার উচ্ছ্বাস যেন সে মুখ দু'খানিকে একটু অতিরিক্ত রঞ্জিত করিয়া দিয়াছে!

একজন মৃদুকণ্ঠে কহিল, "চল্‌না ঠাকুরঝি, সন্ন্যাসী দেখিয়া আসি!"

"কেন, তুই দেখিস্ নাই?"—

"আমি দেখিয়াছি, তোকে একবার দেখাইতাম!"—

"দেখিয়া লাভ?"

"সকলে দেখিল, তুইই বা কেন না দেখিবি, চারু!"

চারু কহিল, "সকলে যাহা করে, আমাকেও যে তাহা করিতে হইবে, তার অর্থ কি?"

"তা' গ্রামে ত এমন কেহই নাই, যে দেখে নাই।"—

"তবু আমি একজন রহিলাম!"—

তর্কে না পারিয়া ললাটলুণ্ঠিত অবগুণ্ঠনটা আর একটু টানিয়া তুলিয়া মৃদু হাসিয়া বধূ কহিল, "তোর সঙ্গে তর্কে পারিব না! কিন্তু ক্ষতি ত নাই? চল্‌না একবারটি, লক্ষ্মী!"—

"তুই যাইতে হয় যা। আমি যাইব না!"

তখন চারু ঘাটে নামিয়া গেল। বধূ সরযূ, উপায় না দেখিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নামিল। উভয়ে জল ভরিয়া কলসী কক্ষে লইয়া

যখন ঘাটের উপরে আসিল, তখন মন্দিরপার্শ্বস্থিত কুরুবকশাখার উপর বসিয়া একটা দোয়েল শিস্ দিতেছিল। মন্দিরের ভিতর হইতে এতক্ষণ বীণের যে মৃদুগুঞ্জন উঠিতেছিল, তাহা থামিয়া গিয়াছে।

চারু কহিল, "ঐ শোন্ তোর সন্ন্যাসীর বীণ্ থামিয়াছে"—

সরযূ কোনও কথা কহিল না, শুধু একটু চক্ষু টিপিয়া ইশারা করিল, চারু তাহার বাম পার্শ্বে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, একটু দূরে একটা কুসুমিত নাগকেশর বৃক্ষের মূলে, গৈরিকপরিহিত কে, মধুমতীর জলের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহার কান্ত বপুর অত্যুজ্জ্বল গৌরবর্ণপ্রভা সেই বৃক্ষতলকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। চারুর বক্ষের মধ্যে একটা গুরুস্পন্দন জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল! সে এতদিন যাহাকে একটি বারের জন্যও আসিয়া দেখিয়া যায় নাই, আজি সে যে এমন করিয়া তাহার চোখের কাছে আসিয়া পড়িবে, সে তাহা একটু পূর্ব্বেও কল্পনা করিতে পারে নাই। সে যখন তাহার চকিত দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিতেছিল, ঠিক তখনই সরযূর কাঁকণে কলসীতে একটু মৃদু বাজিয়াছিল, সন্ন্যাসী মুখ ফিরাইয়া চাহিল, চারুর বিস্ময়চকিত নিবিড় দৃষ্টির উপর তাহার শান্তদৃষ্টি নিবিষ্ট হইতেই সে একটু চমকিয়া উঠিল। চারুর মুখের উপর হইতে তখনও অস্তমিত সূর্য্যের বর্ণসুষমা মিলাইয়া যায় নাই, একখানি স্বপ্নদৃষ্ট দেবী প্রতিমার মুখের মতই সেই মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল!

একটা দ্রুত, নিষ্ঠুর, অতর্কিত স্পন্দন সন্ন্যাসীর হৃদ্‌পিণ্ড হইতে

বাহির হইয়া আসিয়া তাহার প্রত্যেক ধমনীর মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-গতিতে প্রবাহিত হইয়া গেল! সে তাহার চক্ষু ফিরাইয়া লইল, তবু তাহার মনে হইতেছিল, যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তি তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিতেছে। কি সেই শক্তি;—সেই বিপুল মর্ম্ম-চ্ছেদী শক্তিকে সে যেন এইই সর্ব্ব প্রথম অনুভব করিল; স্বীকার করিতে বাধ্য হইল!

সন্ন্যাসী আবার যখন ফিরিয়া চাহিল, তখন চারু ও সরল চলিয়া গিয়াছে, তখন সে দ্রুতপদে ঘাটের উপর আসিল। ঘাট্‌লার পাষাণ বক্ষে তখনও চারু ও সরলার পদচিহ্ন মিলাইয়া যায় নাই। দরিদ্রের অঙ্গণে কমলার চরণাঙ্কনের মতই ঘাটের ধাপে ধাপে সেই দুইটি তরুণীর সিক্তচরণতল চিহ্ন লাগিয়া রহিয়াছে!

তখন সে পল্লীপথটির দিকে চাহিয়া দেখিল, দূরে ঘন আমবনের ছায়ায় ছায়ায় সেই দুই নারী চলিয়া যাইতেছে! সন্ন্যাসীর মনে হইল, এ যেন সেই চিরদিনেরই রহস্যময় পল্লীপথটি, সৃষ্টির আদি-বেলা হইতেই অমনই করিয়া নদীর কূল হইতে উঠিয়া কোন্ অজানা অন্তঃপুরের গোপনপ্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়া থামিয়াছে; এই পথের উপর দিয়াই যেন এমনই করিয়া সেই চিররহস্যময়ী তরুণী চিরদিন আনাগোনা করিতেছে! ব্যথিত, বিস্মিত মর্ম্মের কোন গোপন অন্তঃপুরে, যেন ইহারই স্মৃতিটি জন্মজন্মান্তর নিমেষহীন হইয়া জাগিয়া রহিয়াছে!

সন্ন্যাসী যখন মন্দিরে ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে! মেঘশূন্য আকাশে নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া উঠিয়াছে, মধুমতীর কালো

জল চুম্বন করিয়া উদ্দাম বায়ুপ্রবাহ তাহারই চারিপাশে হা হা করিয়া ফিরিয়াছে !

৩

সরযূ কহিল, "চারু, এ তোর কি হইল, চারু ?"

চারু নতনেত্র না তুলিয়াই মৃদুস্বরে কহিল, "কেন, কি হইয়াছে বোঠান্ ?"—সরযূ কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না, তাহার পদ্মনেত্র অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অঞ্চলপ্রান্তে একবার চক্ষু মুছিয়া কহিল, "চুলগুলিকে এমন করিয়া কাটলি কেন, চারু ?"

চারু হাসিল। সরযূ দেখিল, সেই হাসিটুকু বর্ষণক্ষান্ত মেঘের উপর বিজলীর চকিত উচ্ছ্বাসের মতই তীব্র, করুণ !

"কেন চুল কাটিয়াছি ?—ক্ষতি কি তাহাতে ?—এ একরাশ চুল সারাজীবন টানিয়া মরিব, কেন সুরু ?"

সরযূ এ কথার উত্তর দিতে পারিল না, শুধু দুই বাহু দিয়া চারুর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া, তাহার স্কন্ধের উপর মুখ রক্ষা করিল।

সরযূর নয়নে অশ্রু দেখিয়া চারু কহিল, "কেন বোঠান্, আমি যা' নই, এতদিন মিথ্যা করিয়া আমাকে তাহাই সাজাইয়া রাখিয়াছ ? আজ যদি আমি নিজেই বুঝিয়া সেই মিথ্যা সজ্জাটা দূর করিয়া ফেলিয়া দিই, তাহাতে কাঁদিলে চলিবে কেন, সুরু ? না, আমি সত্যই আজ মুক্তির আনন্দ পাইয়াছি, বোঠান্ !"

সরযূ কহিল, "তা এমন কি তাড়াতাড়ি পড়িয়াছিল ? মা যে তোমার এ বেশ দেখিয়াই শয্যা লইয়াছেন, চারু !"

চারুর মুখের উপর মুহূর্ত্তের জন্য একটা বিষাদের ছায়া পড়িল। তার পরই সে দৃঢ়স্বরে কহিল, "না বোঠান্, এই সব চেয়ে বড় মিথ্যাটা আমাকে ভিতরে ভিতরে পুড়াইয়া ছাই করিতেছিল, আমি কিছুতেই শান্তি পাইতেছিলাম না,—নিজের উপর কি একটা ঘৃণাই হইত, শুধু মার মুখের দিকে চাহিয়াই,—"

"তা' মার যা' শরীরের অবস্থা, কটা দিনই বা তিনি বাঁচিবেন, —এর মধ্যে তাঁকে এমন করিয়া আঘাত—"

"—না করিলেও পারিতাম,—তা' ভাবিয়া দেখিয়াছি, বোঠান, —তবু—"

"তবু কি, চারু?—"

"কি তাহা জানি না, সুরু,—শুধু মনে হইল, ঠিক সত্যটাকেই ধরিয়া যদি শান্তি পাই—"

"এমন হঠাৎ মনে হইল কেন, ঠাকুরঝি?"

সরযূ মুখ তুলিয়া তাহার শান্তদৃষ্টি চারুর মুখের উপর নিবিষ্ট করিয়া কহিল।

এবার চারুর চোখে জল আসিতেছিল। সে সরযূর বুকে মুখ লুকাইল, সরযূ দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া ডাকিল,— "ঠাকুরঝি,—চারু!—"

চারু হঠাৎ মুখ ছাড়াইয়া লইয়া আবার সরযূর পরম শুভ্র কোমল বক্ষের কাছে মুখ লুকাইল, তারপর আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিল, "না, না,—তুমি আর কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না, বোঠান্! আমি যে পথে চলিয়াছি, এইই আমার সত্য পথ।

আমাকে বাধা দিও না, আমাকে এই পথেই চলিতে দাও—” চারু চুপ করিল।

সরযূ কোনও কথা না কহিয়া চারুর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার চক্ষু দিয়া বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়া চারুর কেশবিরল মস্তকে আশ্রয় লইতেছিল।

৪

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে!

হাতের কাছে অযত্নরক্ষিত বীণটা পড়িয়াছিল, সন্ন্যাসী তাহা তুলিয়া লইয়া কিছুকাল বাজাইল; ভাল লাগিল না বলিয়া, বীণ্ ফেলিয়া, পুঁথি তুলিয়া লইল। পুঁথিতে প্রথমটা মনঃসংযোগ হইলেও একটু পরে আর মন বসিল না। তখন পুঁথি রাখিয়া সে মন্দির মধ্যেই পাদচারণা করিতে লাগিল!

মর্ম্মবীণায় বড় ধীরে, বড় সন্তর্পণে একটি নূতন স্বর রহিয়া রহিয়া বাজিতেছিল! সেই সুরটাকে সে যতই জোর করিয়া অস্বীকার করিতে চাহিতেছিল, ততই সেই অতি কোমল সুরটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল!

তখন সে বুঝিল, ইহাকে অস্বীকার করিয়া চাপিয়া রাখিতে চাহিলে, এ নিশি দিনই আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিবে! অন্তরের এই দারুণ বিদ্রোহকে সে যে কেমন করিয়া শান্ত করিবে, তাহা সে কোনও মতেই স্থির করিতে পারিতেছিল না। এক একবার মনে হইতেছিল, এই ধূমায়িত

বিদ্রোহবহ্নির মুখে সে তাহার হৃদয়রক্ত ঢালিয়া দিয়া, তাহাকে নির্ব্বাপিত করিবে! কোথায় অন্তরের মধ্যে, রহিয়া রহিয়া সেই বড় করুণ সুরটি বাজিয়া উঠিতেছে, নিষ্ঠুর আঘাতে সেই স্থানটাকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারিলেই কি এ সুরটা থামিয়া যাইবে? এ কয়দিন পর্য্যন্ত সে ত কত আঘাত করিয়া দেখিয়াছে, তবুও যে সেই সুরটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে! আঘাত পাইয়াও যে সে যাইতে চাহে না, ফিরিয়া ফিরিয়া অন্তরবীণার তারে তারে স্পন্দিত হইতে থাকে,—বাজিতে থাকে!

কি এই নিবিড় সুর! সে তাহার কাছে কি চাহে?

কখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে! মন্দির প্রাঙ্গণ জ্যোৎস্নালোকে প্লাবিত করিয়া মধুমতীর তরঙ্গোচ্ছ্বাসের উপর রজতধারা ঢালিয়া, সপ্তমীর শশাঙ্ক ছিন্ন মেঘের আড়াল দিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল!

সন্ন্যাসী মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিল। ঘাটের উপর দিয়া, বিচিত্রছায়াবৃত পল্লীপথের উপর দিয়া কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিল!

লীলাময়ী প্রকৃতিরাণী তাহার সৌন্দর্য্যের পশরা খুলিয়া বসিয়াছিলেন! এ উদাস অনন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে না চাহিয়া, তাহার বিদ্রোহী, উন্মুখ অন্তর একি কামনা করিতেছে!

না,—তুচ্ছ নারী! কি তাহার সৌন্দর্য্য?—কোথায় তাহার মাধুরী? তাহার লীলাচঞ্চল গতিভঙ্গিমায়, তাহার শুভ্রপীবর বক্ষে, তাহার বিলোল দৃষ্টিতে, তাহার কুসুমপেলব বাহুবেষ্টনীতে, তাহার বান্ধুলিপুষ্পরক্ত অধরপুটে, এমন কি মোহ থাকিতে পারে, যাহা

তাহাকে এই বাধাবন্ধনহীন মুক্তজীবনের আনন্দ হইতে ভুলাইয়া লইয়া যাইতে পারে?

কিন্তু, তাহার অস্থিমজ্জা পেষণ করিয়া, একি উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা, রাক্ষসী পিপাসা লইয়া জাগিয়া উঠিতেছে! সে কেমন করিয়া ইহাকে রোধ করিবে? তাহার সংযম, চিত্তস্থৈর্য্য ডুবাইয়া দিয়া, বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া, একি অননুভূতপূর্ব্ব নিষ্ঠুর মোহ তাহাকে নিবিড় ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে!

আজ তার মনে পড়িতেছিল, শৈশবের সেই স্নেহাগার খানি, জননীর অঙ্কস্বর্গ, পিতার স্নেহতরল দৃষ্টি;—শ্যামল বনছায়াতলে সেই পল্লীপথ; প্রতি সন্ধ্যায় খেলা ফেলিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, জননীর কোলে মাথা রাখিয়া রূপকথা শুনিবার সম, সেই বিদ্যুৎ-গামী অশ্ববরের পৃষ্ঠে চাপিয়া রাজপুত্রের সেই চিররহস্যময়ী রাজ-কন্যার অনুসন্ধানে দীর্ঘ অভিযান; ক্ষুরাঘাতে মেঘ উড়াইয়া, কত দেশ, নগরী, পর্ব্বত, কানন, কান্তার অতিক্রম করিয়া অশ্ব ছুটিয়া চলিয়াছে; কোথায় রাজকন্যা নির্জ্জন পুরীর মধ্যে সোণার কাঠিটির স্পর্শে জাগিয়া উঠিবার অপেক্ষায় নিদ্রিত রহিয়াছে। কখন সে সোণার কাঠির স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়া রাজপুত্রের কণ্ঠে বরমাল্য দান করিবে, তাহারই অপেক্ষায় নিদ্রাতুর শিশু জননীর মুখের দিকে পলকশূন্য নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে! অজানিত আশঙ্কায় শিশুহৃদয় কতবার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে।

হায়, কত স্মৃতি! কত কাহিনী!—তারপর—তারপর—, প্রথম যৌবনে, আঘাতের পর আঘাত আসিয়া সমস্ত স্নেহ-

বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিল; জননীর অঙ্কস্বর্গচ্যুত হতভাগ্য যে দিন পথের ধূলায় লুটাইয়া পড়িল, সে দিন পিতার স্নেহতরলদৃষ্টি তাহাকে অভিসিঞ্চিত করিয়া দিবার অপেক্ষায় ছিল না।

তারপর এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর সে দেশে দেশে ফিরিয়াছে;—কাহারও স্নেহের আহ্বান তাহাকে সংসারে ফিরিবার জন্য মিনতি জানায় নাই; কক্ষচ্যুত উল্কার মত সে শুধু ছুটিয়াই চলিয়াছে। আজ মনে হইতেছিল, জীবনের যে পথ সে অতিবাহন করিয়া আসিয়াছে, সেই দীর্ঘ পথটা যেন বড় নিঃসঙ্গ, নীরস, অকরুণ।—যেন একটা বিরাট ব্যর্থতাকে সে তাহার চারি পার্শ্বে রচনা করিয়া তুলিয়াছে। এ ব্যর্থতার গণ্ডী ভাঙ্গিয়া আর যেন বাহির হইবার উপায় নাই,—পথ নাই।

পথ নাই।—হায়, কেন নাই? সে কি এই গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারে না? যে উন্মাদ প্লাবন আজি তাহার হৃদয়যমুনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কি ঐ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াই গুমরিয়া মরিবে?

হায়, কে তাহার এই অন্ধ উন্মুখ আবেগকে পথ দেখাইবে?

ঐ মুহূর্ত্ত-দৃষ্টা নারী, যাহাকে গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিলেও লাভ করা যাইবে না,—ঐ নারীর কাছেই যে তাহার জীবনের সোণার কাঠিটী পড়িয়া রহিয়াছে, সেই সোণার কাঠির স্পর্শে সে তাহাকে জাগাইয়া তুলিয়া, কোনও মতেই ত আপনার করিয়া লইতে পারিবে না।

তবে সে কাহার জন্য অপেক্ষা করিবে? তাহার দুর্দমনীয় চিত্তবেগ তাহার সংযম নষ্ট করিয়াছে, তাহার ব্রত ভঙ্গ করিয়াছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পলে পলে সে এই তীব্র দহনকে কেমন করিয়া সহ্য করিবে?

যদি তাহাকেই না পাওয়া যায়, তবে, হে রাজরাজ, বিশ্বের ঠাকুর, তুমি ত অন্তর দেখিয়াছ, তুমিই কঠিন, অমোঘ প্রায়শ্চিত্ত করিবার মত শুভ অবসর আনিয়া দাও!

৫

প্রায় ছইমাস কাটিয়া গেল।

সন্ন্যাসী ভাবিল, যেখানে সন্ন্যাসীর সংযম ভাঙ্গিয়াছি, সে স্থান ত্যাগ করিব না। ঠাকুর যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে দেন, এইখানেই করিব।

ঐ পল্লীপথটির উপর দিয়াই সে আসিয়াছিল; ঐ পাষাণ-সোপানের বক্ষে তাহার চরণ অঙ্কন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এই বাতাস তাহার সংসর্পিত অলকদাম চুম্বন করিয়াছিল, ঐ মধুমতীর উচ্ছল বারি তাহার চরণপঙ্কজ প্রক্ষালিত করিয়া দিয়াছিল; আর ঐ উন্মুক্ত আকাশতলে সে দাঁড়াইয়াছিল, অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মি তাহার মুখের উপর মায়া তুলিকা বুলাইয়া দিয়াছিল,—এ স্মৃতি, এ স্বপ্ন ছাড়িয়া সে কোথায় যাইবে!

শুধু সেই একটি দিনেরই স্মৃতি,—তাহাকেই সে কৃপণের ধনের মত বুকের কাছে অতি সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সে আর ত তাহাকে দেখিতে চাহে নাই।

তাহার অপেক্ষা—শুধু প্রায়শ্চিত্তের জন্যই অপেক্ষা,—যে মাটিতে, যে বায়ুপ্রবাহে, যে আকাশের তলে তাহার মধুর স্মৃতিটুকু নিবিড় হইয়া রহিয়াছে, ঠাকুর কি সেই খানেই তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার অবসরটুকুও প্রদান করিবেন না ?

ইহার বেশী ত সে আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করে না !

আবার সায়াহ্নে, প্রভাতে বীণ্ বাজিয়া উঠিতেছিল, বড় করুণ রাগিণীতে,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া, সেই সুর গুমরিতেছিল। ওগো প্রেমের দেবতা, ওগো বিশ্বের অন্তরদর্শী ! এই চিত্তবিক্ষোভকে শান্ত কর, এই অননুভূতপূর্ব্ব অন্তরস্পন্দনকে দূর কর ! এই প্রেমকে, এই আকর্ষণকে, তোমারই দিকে প্রেরণ কর !

এমনি করিয়া আরও কতদিন কাটিল। একদিন প্রভাতে, বীণ্ ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসী দেখিল, উচ্ছল মধুমতীর কূলে কূলে ধ্বংসের চিতানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে ;—ক্ষুদ্র পল্লীতে রুদ্রের বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে। সন্ন্যাসী চাহিয়া চাহিয়া দেখিল ;—তাহার তরুণ মুখের উপর করুণ বেদনার রেখা ফুটিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এবার বুঝি ঠাকুরের আহ্বান আসিয়াছে ;—প্রায়শ্চিত্তের অবসর মিলিয়াছে।

ঐ আর্ত্ত দীন কাঙ্গালের সেবায়, ঐ ব্যথিত পীড়িতের শুশ্রূষায় আজি বুঝি তাহার হৃদয়দেবতার আহ্বান আসিয়াছে। হে বিশ্ব-রাজ ! কি পরিপূর্ণ তোমার প্রেম ! কি অমোঘ তোমার মঙ্গল বিধান !

তারপর সেই তরুণ গৈরিকপরিহিত যুবক, ধীরে ধীরে পল্লী-

পথ ধরিয়া, এতদিন পরে আজই প্রথম, ক্ষুদ্র পল্লীটির মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে হাহাকার উঠিয়াছে, করুণ ক্রন্দনে দিক ভরিয়া গিয়াছে, রুদ্রের বিষাণসঙ্কেতে নিষ্ঠুর মৃত্যুতরঙ্গ জাগিয়া উঠিয়াছে, —মুখে ব্যথিতের স্মিতহাস্য লইয়া সন্ন্যাসী সেই মৃত্যুতরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

৬

অল্পক্ষণ হইল প্রভাত হইয়াছে। দূর্ব্বাশীর্ষে শিশিরবিন্দু লাগিয়া রহিয়াছে। তখনও সূর্য্যরশ্মিপাতে সেই শিশির বিন্দুগুলি মুকুতা-বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে নাই। সরযূর দুয়ারের কাছে আসিয়া চারু মৃদুস্বরে ডাকিল, "বোঠান্"—

সরযূ অনেকক্ষণ জাগিয়াছিল; উঠিয়া আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিয়া কহিল,

"কি ঠাকুরঝি ?"

"চল্, মধুমতী হইতে জল আনিব!"—সরযূ একটু বিস্মিত হইল, আজ তিন মাসের মধ্যে চারু একদিনও মধুমতীতে যায় নাই। সে তাহার কৌতূহলী চক্ষু দুইটি চারুর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া কহিল, "তোর কি হইয়াছে, চারু ? তোর মুখ চোখ অমন হইয়া গিয়াছে কেন, ঠাকুরঝি ?"—

চারু কহিল, "ও কিছু না, তুই কলসী নে, বোঠান্"—চারুর চক্ষে একটা অশ্রুর উচ্ছ্বাস দেখা যাইতেছিল। সরযূ আর কোনও কথা না কহিয়া কলসী লইয়া আসিল। পথে যাইতে যাইতে সরযূ একবার ডাকিল, "ঠাকুরঝি ?"—

"কেন"—

"কি হইয়াছে তোর?"—চারু উত্তর দিল না। দ্রুতপদে মধুমতীর পথ বাহিয়া চলিল। মন্দিরের কাছে আসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চারু কহিল,

"চল্ বোঠান্, সন্ন্যাসী দেখিয়া আসি।"

"চারুর মুখে একি নূতন কথা! সরযূ অধিকতর বিস্ময়ে চারুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, চারুর মুখখানা একেবারে রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছে; সরয একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া পথের উপরেই কলসী রাখিয়া দুইহাতে চারুর স্কন্ধ চাপিয়া ধরিল, কহিল, "যদি তুই আমাকে সব কথা খুলিয়া না বলিস্, আমি এখান হইতে আর এক পা নড়িব না, ঠাকুরঝি! তোর ভাব দেখিয়া সত্যি আমার গা কাঁপিতেছে,—কি হইয়াছে, বল্!"

"কি যে হইয়াছে, তা' আমিও ঠিক্ জানিনা, বোঠান্, তবে কাল রাত্রে রোগীর শুশ্রূষায় সন্ন্যাসী পল্লীতে যান নাই,"—হঠাৎ একটু চুপ করিয়া চারু সরযূর মুখের দিকে চাহিল, সরযূ দেখিল, তাহার চক্ষে ব্যথিতের করুণদৃষ্টি;—চারু চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "তা' এমনটা ত আজ একমাসের মধ্যে হয় নাই,"—তারপর একটু দ্রুত স্বরে কহিল—"চল্ না, একবারটি দেখিয়া আসি, বোঠান্!"—চারুর কণ্ঠস্বরের মধ্যে যেন একটা মিনতির ভাব ছিল, সরযূ তাহা লক্ষ্য করিল; একটু অন্যমনস্ক ভাবে কহিল, "তা' চল্, যিনি সমস্ত পল্লীর বিপদ নিজের গায়ের উপর টানিয়া লইয়াছেন"—সরযূর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই চারু কহিল,

"তাঁহাকে দেখিবার ত কেহই নাই বোঠান্!"—কথাটা বলিয়াই চারু একটু কেমন হইয়া গেল, একটু অপ্রতিভ স্বরে কহিল, "তা' জল নিবার পথে একবারটি দেখিয়া যাই,—আমার যেন কেবলই মনে হইতেছে, তিনি সুস্থ নাই"—চারুর স্বর বেদনাপ্লুত হইয়া আসিতেছিল।

একটা অন্ধ আকর্ষণ অদৃশ্য থাকিয়াই যেন তাহাকে টানিতেছিল; তাহার অন্তরের মধ্যে একটা গুরুস্পন্দন জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে অস্থির চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল! তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, সম্মুখেই রঙ্গমঞ্চ; অন্ধ যবনিকার সঙ্কেতরশ্মি যেন তাহারই উদ্বেগকম্পিত হস্তে অর্পিত রহিয়াছে; সে ঐ যবনিকাখানি তুলিয়া ধরিলেই অভিনয় আরম্ভ হইবে।

আজ এই প্রভাতের অরুণালোক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কেন যে সে এই মধুমতীর পথ ধরিয়া এমন করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহা সে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, কে যেন তাহাকে আকুল কণ্ঠে ডাকিতেছে,—"ওগো এস, এস।"

মন্দিরের কাছে আসিয়াই চারু একটু থমকিয়া দাঁড়াইল; সরযূ স্থিরপদে অগ্রসর হইয়া গেল। দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত ছিল; সরযূ দ্বারের কাছে আসিলেই হঠাৎ একটা মৃদু অস্ফুট চীৎকার শুনিয়া চারু চমকিয়া উঠিল, দেখিল সরযূ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মন্দিরদ্বার হইতেই ঈসারা করিয়া তাহাকে ডাকিতেছে! তখন চারু কম্পিতচরণে, যেখানে সরযূ দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানে তাহারই পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

সরমা ও চারু দেখিল, আস্তৃত গৈরিক অঞ্চলোপরি সেই তরুণ তাপসদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। সেই সুগৌর বপুর উপর কে যেন কালিমা লেপন করিয়া দিয়াছে,—সুবর্ণ মন্দিরচূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! শিথিল-বিন্যস্ত বাহুর পার্শ্বে সুর বাঁধা বীণ্; বুঝি মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও কে জানে, কি সুরে গুঞ্জরিয়া উঠিয়াছিল!

সরমা তাহার অঞ্চল নাড়িয়া, কাঁকণ টানিয়া একটু শব্দ করিল, সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিয়া চাহিল! একটা চকিত মৃদু শিহরণ তাহার সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়া ক্রীড়া করিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে তাহার চক্ষু মুদ্রিত করিতে চাহিল; কিন্তু চক্ষু অর্দ্ধ উন্মীলিতই রহিয়া গেল!

তাহার নিষ্প্রভ কালিমালিপ্ত মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চারুর মুখের দিকে তাহার বিস্ফারিত চক্ষুতারকা স্থির করিয়া মরণাহতের শেষ চেষ্টায় কহিল, "আমার—পুঁথি আর বীণ্"—চারু পুঁথি আর বীণ্ কুড়াইয়া লইয়া আস্তৃত গৈরিকাঞ্চলের কাছেই ভূনতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল এবং তাহার শিথিল হস্তের কাছে তুলিয়া ধরিল।

"—আমার সর্ব্বস্ব—তোমাকে দিলাম,—আর—"

চারুর হাতের একটু স্পর্শ বুঝি তাহার হাতে লাগিয়াছিল, সে আর একবার চক্ষু মুদ্রিত করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিল; তারপর তাহার শিথিল হস্ত মন্দিরতলে লুটাইয়া পড়িল!

তখন পৃথিবীর কোলাহল তাহার চতুর্দ্দিকে মৃদুসঙ্গীতের মত বাজিতেছিল! সেই সঙ্গীতগুঞ্জনের মধ্যে শ্যামসুন্দরের চরণনূপুর-ধ্বনি তাহার কাণের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া বাজিয়া উঠিল!

* * * *

মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিয়া শূন্য কলসী মন্দিরের কাছেই ফেলিয়া রাখিয়া উভয়ে বাড়ীর দিকে ফিরিল! কিছুদূর আসিয়া মৃদুকম্পিত স্বরে চারু ডাকিল, "বোঠান্"—

—"কি ?"—অন্যমনস্কভাবে সরযূ উত্তর দিল।

—"ফিরিয়া চল্"—

—"কোথায় ?"—

কোনও কথা না কহিয়া চারু আবার মধুমতীর দিকে ফিরিল। মন্দিরের কাছে আসিয়া দৃঢ়কণ্ঠে চারু কহিল, "কলসী তুলিয়া নে, বোঠান্, জল লইয়া যাইব"!—চারুর অস্বাভাবিক দৃঢ়স্বর শুনিয়া সরযূ একটু চমকিয়া উঠিল, কলসী দুইটাই তুলিয়া লইল! চারু ধীরপাদবিক্ষেপে ঘাটের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া নামিয়া গেল! তারপর হাতের পুঁথি ও বীণ্ একবার মাথায় ঠেকাইয়া মধুমতীর জলে ভাসাইয়া দিল।

কলসী ভরিয়া লইয়া চারু ও সরযূ যখন উপরে উঠিয়া আসিল, তখন প্রভাতারুণের কোমল দীপ্তিতে ও পল্লীর শোকসন্তপ্ত জনগণে মন্দিরসম্মুখ ভরিয়া গিয়াছে। কোনও দিকে না চাহিয়া চারু ও সরযূ নীরবে সেই চির পুরাতন পল্লীপথটি অতিবাহন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল!

দীনু

১

বাড়ীতে একটি পুরাতন ভৃত্য ছিল, দীনু।

তাহার নাম দীননাথ, কি দীনেশ, কি দীনদয়াল অথবা দীনশরণ তাহা কেহ জানিত না। বয়োবৃদ্ধেরা ডাকিতেন, দীনু; বালক ও যুবকেরা ডাকিত, দীনুদা কি দীনু কাকা, বা ঐ রকমই একটা কিছু।

সে বিশ্বাসী, সরল, প্রভুভক্ত। কর্ত্তার আমলের লোক, পঞ্চাশ বৎসরের উপর এ বাড়ীতে চাকরী করিয়া, এখন সকল পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য হইতেই অবসর গ্রহণ করিয়াছে। তবু একটা কাজ তাহার ছিল; সেটি হইতেছে, বাটীর ছেলেমেয়েগুলির তত্ত্বাবধান করা। দীনু এ বাড়ীতে প্রথম আসিয়া যাহাদের কোলে করিয়াছিল, আজ তাহাদেরই ছেলেমেয়েদের কোলে করিতেছে, এবং এই দ্বিতীয় দলের ছেলেমেয়ের মধ্যে যাহারা বহুদিন পূর্ব্বে দীনুর কোল ছাড়িয়াছে, এবং যাহাদের বিবাহও হইয়াছে, দীনু এমন আশাও রাখে যে, তাহাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও সে খেলা করিয়া যাইতে পারিবে।

সূর্য্যের শেষ রশ্মি যখন মায়াতুলিকার স্পর্শ দিয়া পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত করিয়া তুলিত, তখন দীনু ছেলেমেয়েগুলিকে ডাকিয়া

একত্রিত করিত। তাহাদের হাত মুখ ধুয়াইয়া মুছাইয়া দিয়া, খোলা ঝুল-বারান্দার উপরে তাহাদিগকে লইয়া বসিয়া পড়িত; দীনুদা এখনই এই ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্য দিয়া যে তাহাদিগকে এক অজ্ঞাত মায়ারাজ্যের সীমারেখার কাছে টানিয়া লইয়া যাইবে, তাহাই মনে করিয়া শঙ্কাজড়িত পুলকে ছেলে-মেয়েগুলি শিহরিয়া উঠিত। সেই মায়ারাজ্যের রাজপুরীর মধ্যে শুধু এক রাজপুত্রেরই প্রবেশাধিকার রহিয়াছে, এবং সেই রাজ-পুরীর মধ্যে এক রূপসী রাজকন্যাকে সোনার কাঠির স্পর্শে জাগাইয়া এক দুর্দ্ধর্ষ অশ্ববরের পৃষ্ঠে টানিয়া তুলিয়া লইয়া, রাজপুত্র সেই যে কখন জ্যোৎস্না-পুলকিত নীলাকাশের মধ্য দিয়া ছিন্নমেঘের ছায়ায় ছায়ায় বিপুল বেগে, কত রাজ্য, কত নদ নদী, পর্ব্বত কান্তার পার হইয়া স্বরাজ্যাভিমুখে চলিয়া যাইবে—তাহারই অপেক্ষায় ছেলেমেয়েগুলি পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে বসিয়া রহিত।

এমনি করিয়া কত সন্ধ্যা কাটিয়াছে; কত শিশু এই রূপ কথার মোহের মধ্য দিয়া কৈশোরে পৌছিয়াছে। তারপর কবে কৈশোরের সীমান্ত রেখায় পৌছিয়া শ্রোতার আসন আর একদল শিশুর কাছে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছে,—কিন্তু,—দীনু—ঠিক সেই দীনুই আছে!—শুধু বৎসরের পর বৎসর গুলি ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহার কর্ম্মঠ দেহযষ্টিকে পুরাতন মন্দির চূড়ার মতই জীর্ণ ধ্বংসোন্মুখ করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু সন্ধ্যাও প্রত্যহ তেমনি আসে। দীনুর শ্রোতাও তেমনই

জুটে, সুতরাং সে নিয়মমতই ছেলেমেয়েগুলির কাছে সেই চির-নবীন মায়ারাজ্যের তথ্য আবিষ্কার করিয়াই রহিতে থাকে।

২

কতকাল পরে এক সন্ধ্যায় দীনু দেখিল, তাহার শ্রোতার দল দুইটি বালক আর একটি বালিকাতে পরিণত হইয়াছে।

সংসারের সহস্র পরিবর্ত্তনের পর প্রকাণ্ড বাড়ীটার মধ্যে যাহারা প্রভুর আসন গ্রহণ করিল, তাহাদের মধ্যে সম্পর্কের একটু ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা সহোদর নহে; একই পিতামহের সন্তান, সুরেশ ও সতীশ। সুরেশ খুল্লতাতজ ভ্রাতা সতীশের সহিত একই পিতামহীর স্নেহাঞ্চল তলে বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু আজ আর পিতামহীও ছিলেন না। উভয়ের জননীও ছিলেন না। উভয়ের জননীর মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্প্রীতি ছিল, আজি যে বধূদ্বয় অবস্থার পরিবর্ত্তনে মাথার ঘোমটা একটু খাটো করিয়া দিয়া কর্ত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সে সম্প্রীতিটুকুর একান্তই অভাব ছিল।

উভয়েই সমবয়স্কা, সুরেশের স্ত্রী সুকুমারী, এবং সতীশের স্ত্রী কুসুম।

একই সংসারের মধ্যে দুইটি সমবয়স্কা নারীর যদি গৃহকর্ত্রীর আসন গ্রহণ করিবার জন্য স্পৃহা থাকে, তাহা হইলে, সেই সংসারের মধ্যে কোন ক্রমেই আর শান্তির আশা করা যায় না।

সুরেশ বয়সে সতীশ অপেক্ষা এক মাসের বড়, সুতরাং সংসারের কর্ত্রীর আসন ন্যায়সঙ্গত ভাবে দেখিতে গেলে সুকুমারীরই প্রাপ্য,

কিন্তু সুকুমারী ও কুসুমের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য বর্ত্তমান ছিল। সুকুমারী সরলা, শান্তিপ্রিয়া, কুসুমকে সে যথেষ্ট স্নেহ করিত; এবং সে সেই স্নেহের অধিকারটুকুকে খর্ব্ব করিয়া, কর্ত্তৃত্বের দাবীটাকে বড় করিয়া দেখিবার পক্ষপাতিনী ছিল না। কুসুমের কাছে দুইটা শক্ত কথা শুনিয়াও যদি শান্তি রক্ষা করিতে পারা যায়, সে তাহাই চাহিত।

কুসুম আঘাত করিতেই জানিত, কিন্তু সেই আঘাতের উপর প্রলেপ প্রয়োগ করিতে জানিত না।

তবু প্রথম বধূজীবন কাটিয়া গেল।

সতীশের মা যেদিন সুরেশের স্ত্রীকে ডাকিয়া তাহাকেই গৃহ-কর্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা করিয়া সংসার হইতে সেই অজ্ঞাত লোকোদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন, সেদিন তিনি যেমন সকলকেই কিছু না কিছু বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছিলেন, তেমন—কুসুম তাহার নিজেরই পুত্রবধূ,—তাহাকেও ডাকিয়া কাছে আনিয়া বলিলেন, "দিদি আমার হাতে সংসারের কর্ত্রীত্ব দিয়া গিয়াছিলেন, আজ আমার ডাক পড়িয়াছে,—বড় বৌমা, লক্ষ্মীটি আমার, এখন তুমিই বড়, এ সংসারের ভাল মন্দ মান অপমান তোমার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছি;—বৌমা, তুমি তোমার দিদিকে ভক্তি করিও। এই ভিটার সম্মান বজায় রাখিবার ভার এবং এতগুলি ছেলেমেয়ের ভার তোমাদের উপরেই রাখিয়া যাইতেছি," —সুকুমারীর হাতের উপর কুসুমের হাতখানা তুলিয়া দিয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

তারপর কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। সুরেশ সতীশের চেয়ে এক মাসের বড় বলিয়াই সুকুমারী যে সতীশেরই মার নিকট হইতে গৃহিণীপণা লাভ করিল, এ কথাটা একটা কাঁটার মত কুসুমের অন্তরে ফুটিয়া রহিল।

সতীশের মাতার মৃত্যুর আট বৎসর পরে সুকুমারীর চারি বৎসরের পুত্রটি ও কুসুমের তিন বৎসরের কন্যাটি দীনুর সান্ধ্যসভায় শ্রোতার আসন গ্রহণ করিয়াছে।

আট বৎসরে সংসারের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

কে পাঁচশত বৎসর পরে পূর্ব্ব-পরিচিত হর্ম্ম্যরাজিশোভিত নগরীর অনুসন্ধান করিতে যাইয়া সেখানে অগাধ জলধির উত্তাল তরঙ্গরাজি ক্রীড়া করিতে দেখিয়াছিল, পুনরায় পাঁচশত বৎসর পরে সমুদ্র খুঁজিতে আসিয়া অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা লক্ষ্য করিয়াছিল, আর পাঁচশত বৎসর পরে আসিয়া দেখিয়াছিল, তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ কোথায় ধূলায় মিশিয়াছে, এক বালুকণাচ্ছাদিত মরুভূমি সূর্য্যকিরণ স্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতেছে!

বধূজীবনেই কুসুমের হৃদয়ে যে বিদ্রোহাগ্নি ধূমায়িত হইতেছিল, আট বৎসর পরে তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া সংসারের মধ্যে এক অসহ্য জ্বালার সৃষ্টি করিয়া তুলিল। সতীশ ক্ষুদ্র পতঙ্গবৎ সে জ্বালার মুখে আত্মসমর্পণ করিয়া পুড়িয়া মরিতেছিল!

৩

"না এমন ক'রে আমার আর সংসার করা পোষাবে না, আমি বলে রাখ্ছি কিন্তু",—কুসুম সতীশের মুখের উপর

তাহার বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া তীব্রকণ্ঠে এই কথা কহিল।

"তা সে ত আর নূতন কথা কিছু নয়",—সতীশ একবার পত্নীর মুখের দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিল, তারপর আবার টেবিলের উপর খোলা বই খানার পাতার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিল।

তীব্র স্বরে কুসুম কহিল, "অর্থাৎ ?—কি বল্‌তে চাও তুমি আমাকে ?"—

"কিছুই বল্‌তে চাইনে,"—

"তবু",—

"কিছু বল্‌তেই যদি না চাই, তা'হলে একটা 'তবু' আস্‌বে কোথা থেকে বুঝ্‌তে পার্‌লাম না—"

কুসুম এমন কথা শুনিয়া একটু দমিয়া গেল ; কিন্তু সে তাহার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিল,—"কিছু না বল্‌তে চাও, ভাল কথা। আমার যা' বল্‌বার আছে, তা' আমি বলে যাচ্ছি ;—তারপর তোমার বিচারে যা' লয়, তুমি তা ক'রো। শোন, আমি পরিষ্কার বল্‌ছি, এভাবে আমার পোষাবে না"—

—"বিদ্রোহ কর্‌বে নাকি ?"—

বাধা পাইয়া কুসুম জ্বলিয়া উঠিল,—তীব্রকণ্ঠে কহিল, "বিষ খেয়ে মর্‌ব"—কুসুম ফিরিয়া দাঁড়াইল, তারপর দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য দুয়ারের দিকে কতকটা অগ্রসর হইয়া গেল।

সতীশ দেখিল সে প্রমাদ ঘটাইয়াছে। হাত বাড়াইয়া কুসুমের

সাড়ীর প্রান্ত টানিয়া ধরিল! বাধা পাইয়া কুসুম আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—

—"ছাড়।"—

"শোন,—ছাই, ঠাট্টাও বোঝ না,"—

আত্মরক্ষা করিবার উপযুক্ত কোনও অস্ত্রই সতীশের হাতের কাছে তখন আর ছিল না। তাই সে শক্তিশেলের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মত একটি ক্ষুদ্র বাণ প্রয়োগ করিল!

কুসুম তাহার সুগান্ধ একটু সঙ্কুচিত করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল; সতীশ বুঝিল, সে শুধু পরাজিতই হয় নাই, অপদস্থও যথেষ্ট হইয়াছে। তখন সে বুদ্ধিমানের মত একেবারেই বিপক্ষের করুণা ও বিচার বুদ্ধির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আত্মসমর্পণ করিল!

তবু কুসুম তাহার অঞ্চল টানিয়া লইয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল!

সেই রাত্রিতেই মান অভিমান ও অশ্রুজলের মধ্যে স্বামীস্ত্রীর দ্বন্দ্ব মিটিয়া গেল!

সতীশ বুঝিল, রূপসী কুসুমের অশ্রুজলকে উপেক্ষা করা তাহার কর্ম্ম নহে। সুতরাং সে বুদ্ধিমানের মত কুসুমের রক্তাধর পল্লবের উপর তীব্র অভিমানস্ফুরণের পরিবর্ত্তে যাহাতে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে, অতঃপর সেই চেষ্টাতেই মনোনিবেশ করিল!

৪

ব্যাপারটা এমন কিছু নহে যাহাতে ভ্রাতাদের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে। কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে কোনও কারণে যদি মনের অকৌশল উপস্থিত হয়, তখন কেহই কাহারও এতটুকু ত্রুটিটিকেও ক্ষমার চক্ষে দেখিতে চাহেনা। প্রত্যেক খুঁটিনাটি অবলম্বন করিয়া সময়ে অসময়ে এক একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়া যায়! একপক্ষ যদি কোনও কথা গায়ে না তুলিতে চাহে, অপর পক্ষ ক্রমাগত আরও রূঢ় হইয়া উঠিতে থাকে। এই রূঢ়তা সহ্য করিবারও একটা সীমা আছে, যে সীমার কাছে পৌছিলেই আগুন জ্বলিয়া উঠে! সে আগুন নিভাইবার ইচ্ছা তখন আর কাহারও থাকেই না, বরং উভয় পক্ষেরই শুধু মনে হয়, একটা চূড়ান্ত কিছু হইয়া যাউক, তাহার পরে যদি শান্তি আইসে!

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে দীনু সতীশের কন্যাটিকে কোলে করিয়া বারান্দার উপর দিয়া পাইচারি করিয়া বেড়াইতেছিল। সুকুমারী সাংসারিক নানা কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, ছেলে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না; পায়ে পায়ে ঘুরিতেছিল; দু'বার পড়িয়া যাইয়া বেদনা পাইয়া কাঁদিল। তখন সুকুমারী ছেলের দুইহাত ধরিয়া উঁচু করিয়া টানিয়া আনিয়া, যেখানে দীনু ঘুরিতেছিল, সেই খানে বসাইয়া রাখিল, মৃদুস্বরে কহিল, "থাক্, দাদুর কাছে!—ছেলে মার অঞ্চল ধরিয়া টানিল,—কিছুতেই ছাড়ে না; দীনু কুসুমের কন্যাটিকে কোল হইতে নামাইয়া রাখিয়া, ছেলে কোলে করিল! দাদুর দৃঢ় আলিঙ্গনের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া অশান্ত ছেলে, দুই একবার

ছাড়াইয়া নামিবার চেষ্টা করিল, অকৃতকার্য্য হইয়া দীনুর কাণ টানিয়া ধরিল, এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই দাদুর সহিত আপোষ করিয়া লইল। মেয়ে কাঁদিতেছিল, কুসুম তাহার ঝি পাঠাইয়া দিয়া মেয়ে নেওয়াইল; এবং তাহার পিঠে দু'ঘা বসাইয়া দিয়া কহিল, "হতভাগা মেয়ে, আমার হাড় জ্বালাতে এসেছে!"—মেয়ে মার ক্রোধের কারণ বুঝিল না, মার খাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বারান্দার কাছ দিয়া সুকুমারী যাইতেছিল, সে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিল, "আহা, ওকে এমন ক'রে মারলি কুসুম!—"

সুকুমারী মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য হাত ধরিয়া টানিল; কুসুম তীব্রদৃষ্টিতে একবার সুকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া মেয়ে টানিয়া নিয়া জোর করিয়া মাটীর উপরে বসাইয়া দিয়া কহিল, "থাক্ এই মাটীতে বসে, তোর আবার কোল কি রে হতভাগা মেয়ে!"—অবুঝ শিশু আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল। সুকুমারী তাহাকে কোলে তুলিয়া নিতে নিতে কহিল,—

"ছিঃ, এমন করে শিশুকে মারতে হয়,—ও কি বোঝে কিছু?"—

কুসুম তীব্র কণ্ঠে কহিল, "থাক্ আর মায়া দেখাতে হবে না,—জানা আছে সব আমার!"

সুকুমারী তাহার বিস্মিত দৃষ্টি কুসুমের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া কহিল,—

"কি তোর জানা আছে রে, কুসুম ? কি যে বলিস্—রাগ হলে জ্ঞান থাকেনা !" কুসুমের মুখে এমন একটা উত্তর আসিতেছিল, যাহা তাহার জিহ্বাগ্রে আসাতেও সে শিহরিয়া উঠিল ! শুধু কহিল,—"তোমার ত থাকে, তা' হলেই হবে।"—

সুকুমারী একটু হাসিল,—সে কুসুমের ব্যবহারে আঘাত পাইয়াছিল, একটু বিরক্তও হইয়াছিল, তবু হাসিল !—সে হাসিটুকু ক্ষমার হাসি, উপেক্ষার হাসি ! সুকুমারী কহিল,—"তা, তুই যা' বুঝিস ! মেয়ে আমি নিয়ে যাচ্ছি, আমার উপর রাগ করে অবুঝ শিশুকে মারিস্‌নে, বরং তোর ভাল লাগে আমাকেই যা' হয় দু'কথা বলিস্ !—ষাট্, আমার যাদু ! পিঠে পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ বসে গেছে !"—মেয়ে কোলে করিয়া মেয়ের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুকুমারী চলিয়া গেল ! কুসুম দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, "কত কথাই আমি তোমাকে বলে থাকি !—তাই এখন লোকের কাছে ব'লো !"—

সুকুমারী কথাটা শুনিল, কিন্তু কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। কুসুম দলিতা সর্পিণীর মত রোষে, ক্ষোভে ফুলিতে লাগিল।

৫

দীনু দুয়ারের কাছে আসিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "সতু—ছোট বাবু !"—সতীশ কক্ষের মধ্যে ছিল ; একবার ফিরিয়া দীনুর মুখের দিকে চাহিল ! তারপর মুখ ফিরাইয়া লইল !

সেই দীনু কাকা ; বাল্যে যাহার সঙ্গ তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন

আনন্দ প্রদান করিয়াছে ! যাহার স্নেহ, যত্ন, জননীর পুণ্য স্তন্যধারার মতই তাহাকে রক্ষা করিয়াছে—বাড়াইয়া এত বড়টি করিয়াছে ; যাহার নিঃস্বার্থ ভালবাসার ঋণশোধ দেওয়ার কল্পনাও করা চলে না ! যে ভৃত্যের মূর্ত্তিতে তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বান্ধবের যত্ন দিয়াছে,—কোনও প্রতিদানই চাহে নাই—শুধু দিয়াছেই ! সে সংসারের কেহ নহে,—তবু তাহাকে না হইলে একদণ্ড সংসার চলে নাই ; সমস্ত সংসারটা যেন তাহাকেই অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে ; যাহার নয়নে পিতার স্নেহস্রাবী দৃষ্টি ; বক্ষে যাহার অক্লান্ত ভ্রাতৃ-স্নেহ ; যুক্তপাণিতে বিশ্বস্ত ভৃত্যের সেবা,—সেই দীনু তাহাকে ডাকিতেছে, তবু সতীশ উত্তর দিল না।

দীনু বুঝিল, সতীশ প্রভু, সে ভৃত্য ! যে কক্ষে তাহার অবাধ গতি, সেই কক্ষে সে প্রবেশ করিল না ; বাহিরে দাড়াইয়া কম্পিত-কণ্ঠে আবার ডাকিল, "ছোটবাবু !"—

সতীশের চোখে জল আসিতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, ছুটিয়া যাইয়া সেই বাল্যকালের মতই আবার দীনু কাকার কণ্ঠলগ্ন হয়। প্রশ্ন করিয়া, অত্যাচার করিয়া, আবার তাহার মুখে হাসি ফুটায় !

—কিন্তু !—আর ত তাহা চলে না ! আর ত সে সেই চপল-কিশোর সতীশ নহে !

হায়, কোথায় গেল, সেই সোণার দিন,—যখন অন্তরদহন গোপন করিবার জন্য ছদ্ম-আবরণ টানিতে হইত না ; যখন চোখের জলে হৃদয়ের কালিমা মুহূর্ত্তের মধ্যে মুছিয়া যাইত।

হায়, কেন গেল, সেদিন!—কোথায় গেল সেদিন!

আজ অন্তর যাহা চাহে, মুখে তাহা প্রকাশ করিয়া বলা চলে না। মুখে যাহা বলা যায়, অন্তর তাহা চাহে না।

ক্ষুব্ধ সতীশ দীনুর দিকে না ফিরিয়া ত্রস্ত চরণে পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিল; সেখানে বিদ্যুৎবরণী কুসুম কক্ষ আলো করিয়া বসিয়াছিল। সে তাহার বাক্স তোরঙ্গ গুছাইতেছিল।

সতীশ মুগ্ধ নেত্রে একবার কুসুমের দিকে চাহিল—তার পর ধীরে ধীরে ডাকিল,—"কুসুম!"—কুসুম চক্ষু না তুলিয়াই কহিল "কি?"—

"কুসুম! এখনও সময় আছে, আমি দীনুকাকার চোখের জল দেখিয়া আসিয়াছি! মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠেছে,—কুসুম! এখনও ফেরা যায়"—

কুসুম স্বামীর মুখের দিকে একবার তীব্র কটাক্ষে চাহিল; সতীশ দেখিল, সে চক্ষু জ্বলিয়া উঠিয়াছে,—মুখ ফিরাইয়া লইয়া কুসুম কহিল, "কেন, আমি ত আর তোমায় জোর করে নিয়ে যাচ্ছি না; তুমি পুরুষ মানুষ—তুমি যদি এ সহ্য করে থাকতে পার, তা'হলে মেয়েমানুষ আমি, আমার কি আট্‌কাবে?—আমার ত দাসীপণা সয়েই গেছে!"—অভিমানে কুসুমের রক্তপুষ্পদল-পেলব অধরপল্লব একটু একটু স্ফূরিত হইতেছিল; তাহার কজ্জল-রেখাঙ্কিত কালো চোখের কোণে বুঝি একটা অশ্রুর উচ্ছ্বাসও ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল! সতীশ বুঝিল, কুসুমকে বুঝান বৃথা! সে যে পথে ঝুঁকিয়াছে, সে পথে যাইবেই এবং তাহাকে

টানিয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতাও সে রাখে। কোনও কথা না কহিয়া সতীশ ফিরিতেছিল, কুসুম একটু তীব্রস্বরে কহিল, "তবে জিনিষ পত্র গুছান বন্ধ কর্‌ব কি ?"—

"না, থাক্—হাঁ, গুছাও তা' হলে,"—সতীশ একটু অন্যমনস্ক-ভাবে এই কথা কহিল,—তারপর ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। কুসুম একবার মুখ তুলিয়া সতীশের গমনপথের দিকে চাহিল, তার পর অনুচ্চস্বরে কহিল, "বাড়ী বসে এ দাসীপণা আমি কর্‌বই না—এ আমি বলে রাখ্‌ছি !"—তারপর দ্রুত নিপুণ হস্তে কাপড়চোপড়গুলি ট্রাঙ্কের মধ্যে গুছাইয়া রাখিতে লাগিল !

৬

শ্রাবণের অপরাহ্ণ ; বর্ষণ-ক্লান্ত মেঘের আড়াল দিয়া সূর্য্যরশ্মি ঠিকরিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল। কালো, ছিন্ন মেঘগুলির পার্শ্বদেশ উজ্জ্বল রৌপ্যমণ্ডিতবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। সলিলসিক্ত শ্যাম তরুরাজির উপরে সেই সূর্য্যালোক পতিত হইয়া একটি পরম রমণীয় শোভার সৃষ্টি করিতেছিল। মনে হইতেছিল, সৃষ্টির প্রথম সন্ধ্যায়ও বুঝি এমনই কোমল সূর্য্যালোকের মধ্যে তরুণী প্রকৃতিরাণী হাসিয়া উঠিয়াছিল ; সে দিনকার শ্যামল নবীন বনানীর উপরেও রাঙ্গারবি এমনই করিয়া তাহার মোহিনী তুলিকা চকিতে বুলাইয়া গিয়াছিল। জলে, স্থলে বুঝি এমনই আনন্দ, পুলক জাগিয়া উঠিয়াছিল !

দ্বিতলের একটা ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে পশ্চিমের দিককার একটা

খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সতীশ আকাশে মেঘের খেলা দেখিতেছিল।

সূর্য্য মেঘের আড়াল দিয়া ডুবিয়া গেল! কালো মেঘগুলি আরও কালো হইয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছিল। দিনের আলো নিভিবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যাসুন্দরী ধরণীর আর্দ্র পৃষ্ঠের উপর স্বীয় নীলাঞ্চলখানি টানিয়া দিতেছিলেন! কখন গোধূলির অবসান হইয়া সন্ধ্যার আরম্ভ হইয়াছে, বুঝা যাইতেছিল না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, তবু সতীশ আকাশের দিকেই চাহিয়া সেই জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম আসিয়া ডাকিল, "কি গো,—জানালার কাছেই দু'ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছ—ব্যাপার কি? খুকীকে একবার দেখ্‌বে না? তার ভারি জ্বর হয়েছে যে!—"

সতীশ ফিরিয়া চকিত দৃষ্টিতে কুসুমের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"অঁ্যা—কি?"

"খুকীর আবার জ্বর এসেছে, একটিবার দেখে যাও।"

খুকীর জ্বরটা ভাল নহে; জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সতীশ এতক্ষণ তাহাই ভাবিতেছিল। আবার জ্বর আসিতেছে শুনিয়া তাহার মুখের উপর চিন্তার ছায়াটা আরও একটু গাঢ় হইয়া উঠিল। দাঁতে ওষ্ঠ চাপিয়া চকিত দৃষ্টি কুসুমের উপর স্থাপন করিয়া সতীশ কতকটা সময় চুপ করিয়া রহিল; তারপর ধীরে ধীরে—কহিল, "আবার জ্বরটা এল, বড় ভাবনার কথা হ'ল যে! চল, দেখ্‌ব!"

পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া শয্যার দিকে চাহিয়া সতীশ দেখিল, ক্ষুদ্র হাত দুইখানি মুঠা করিয়া বুকের উপর রাখিয়া, চক্ষু বুজিয়া খুকী শুইয়া রহিয়াছে! জ্বরের প্রবল উত্তাপে তাহার সুগৌর মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে! কপালের দুই পাশের শিরা দুইটি, উৎক্ষিপ্ত শোণিত স্রোতের প্রবাহে, অতি দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল।

সতীশ শয্যার কাছে আসিয়া একটু নীচু হইয়া মৃদুকম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, "খুকু"—

খুকী সেই ডাক শুনিয়া একটু চমকিয়া উঠিয়া একবার চাহিবার চেষ্টা করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল।

সতীশ তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিল, জ্বরটা খুবই বাড়িয়াছে, এবং জ্বরের রাগে শিশু হাঁপাইতেছে।

দুইদিন পরে এক রাত্রিতে খুকীর শিয়রে সতীশ ও কুসুম বসিয়াছিল। উভয়েরই হৃদয় শঙ্কাব্যাকুল, নয়নে ব্যথিত দৃষ্টি উভয়েই একদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বালিকার রোগপাণ্ডুর মুখখানির দিকে চাহিয়া ছিল। কুসুম সাহস করিয়া সতীশের মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছিল না। আশঙ্কা, পাছে সতীশের অশ্রুব্যাকুল দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা কিছু সে আবিষ্কার করিয়া বসে, যাহা তাহার কাছে আশার সংবাদ বহন করিয়া আনিবে না।

খুকীর শীর্ণ ওষ্ঠপুট মধ্যে মধ্যে নড়িতেছিল; কুসুম তাহার মুখের কাছে মুখ নিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিতেছিল,—"খুকুরে—যাদু আমার!"

সেই উচ্ছ্বসিত আহ্বানে কে উত্তর দিবে? খুকী তাহার

রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটা মেলিয়া এক একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছিল,—একবার দুই হাত তুলিয়া কাতর স্বরে কহিয়া উঠিল, "দাদু,—আমি দাড় যাব।"

কুসুম বুঝিল, তাহার অভিমানদৃপ্ত নারীপ্রকৃতিই এই দারুণ বিপদকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে। এই বিপদ যেন দেবতার উদ্যত বজ্রের মতই কঠিন, অমোঘ, নির্ম্মম! কখন তাহার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবে,—কে জানে? কুসুম শিহরিয়া উঠিল; আজই সে সর্ব্বপ্রথম বুঝিল, কতখানি তাহার অপরাধ; এ কথাটা সে যেমন করিয়া বুঝিল, আর কেহ ত তেমন করিয়া বুঝিতে পারে না!

সে স্বামীর কাছে অপরাধিনী, নিজের কাছে অপরাধিনী, এ কি সেই অপরাধেরই প্রায়শ্চিত্ত করিবার কঠোর মুহূর্ত্ত আসিয়াছে!

ঐ ক্ষুদ্র বালিকা পুষ্পকোরকের মতই সে নিষ্কলঙ্ক, সে কি আজ তাহারই অপরাধের উত্তাপে শুকাইয়া উঠিয়াছে?

উহার পাণ্ডুর ওষ্ঠপুটের প্রত্যেক কম্পনটি, শ্রান্ত নয়নপল্লব উন্মীলনের প্রত্যেক ব্যর্থ চেষ্টাটি, হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দনটি কুসুমের বুকের মধ্যে এক অননুভূতপূর্ব্ব উদ্বেগ ও বেদনার সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল।

খুকু,—যাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জীবনের স্ফুরণ, গতিতে সলীল ভঙ্গিমা, যাহার মুখে জীবনের প্রথম অস্ফুট কাকলী, যাহার হাসিতে অনন্ত মাধুরী, ক্রন্দনে মমতাকর্ষণ চেষ্টা,—ঐ সেই খুকু,

তাহার পুষ্পপেলব দেহলতা শয্যার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার মুখে হাসি নাই, নয়নে আনন্দদীপ্তি নাই, কণ্ঠে কাকলী নাই।

কেন নাই? কেন এমন হইল! হে ঠাকুর—তোমার দুয়ারে মাথা খুঁড়িয়া মরিব,—বুকের রক্ত দিয়া তোমার রাতুলচরণ চর্চ্চিত করিব, শুধু খুকুকে ফিরাও। ঐ রোগকাতর মুখখানির দিকে আর ত চাওয়া যায় না!

কুসুম খুকীর ললাটে কপোলে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ভাবিতে লাগিল, যদি এমনই করিয়া তাহার সমস্ত বেদনা, দহন, পীড়া হরণ করিয়া লওয়া যাইত! সে পীড়াভার তাহাকে বহন করিতে দিয়া যদি ঠাকুর খুকুকে নিরাময় করিয়া দিতেন!

কি করিলে তেমনটি হইতে পারে? একটা গিনি খুকুর ললাটে স্পর্শ করাইয়া কুসুম তুলিয়া রাখিল,—খুকু ভাল হইলে ঠাকুরের ভোগ দিবে!

খুকুর মুখের দিকে চাহিয়া সে হৃদয়কে শান্ত করিতে পারিতেছিল না।

কুসুম দেখিল, খুকী মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠিতেছে; সে সতীশের আনত মুখের দিকে একবার তাহার উদ্বেগাকুল দৃষ্টি স্থাপিত করিল। তারপর কাতর কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "ওগো, অমন করে কেন খুকু?"

সতীশ কোনও উত্তর না দিয়া কুসুমের অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে চাহিল, তারপর একটা অঙ্গুলি তুলিয়া নিজের ললাট স্পর্শ করিল!

খুকী আবার চমকিয়া উঠিল। একবার চক্ষু খুলিয়া চারিদিকে চাহিল, তারপর চীৎকার করিয়া উঠিল—"দাদু,—আমি যাব"—সঙ্গে সঙ্গে কুসুমও চীৎকার করিয়া উঠিয়া খুকীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল!

সতীশ খুকীকে টানিয়া নিয়া শয্যার উপর শোয়াইয়া দিল; মাথায় জলের ধারা দিতে দিতে কহিল,—"বুঝিতেছ কিছু?"—সতীশের কণ্ঠস্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা, অথচ একটু তীব্র! ভীতভাবে কুসুম কহিল, "কি?"—

"অভিমান করে, জেদ করে, চলে এসেছিলে, এ বুঝি তারই শাস্তি,"—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কুসুম স্বামীর দুই পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, "ওগো, চুপ কর, চুপ কর! ঠাকুর যদি মুখ তুলে না চান,—তুমি অন্ততঃ এ রাক্ষসীকে ক্ষমা কর,"—

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কে দুয়ারে আঘাত করিল, সতীশ উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল! উন্মুক্ত দ্বার পথে ভোরের নির্ম্মল বায়ুর একটা শান্তপ্রবাহ পুষ্পগন্ধ বহন করিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল; সতীশ চাহিয়া দেখিল, দুয়ারের সম্মুখে দেবদূতেরই মত কে দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—তাহার শুভ্র কেশ, প্রশান্ত নয়নদৃষ্টি! সতীশ মুহূর্ত্তের মধ্যে ছুটিয়া যাইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, —"দীনুকাকা, তোমার খুকুকে বাঁচাও!"—

অবগুণ্ঠন একটু টানিয়া দিয়া কুসুম কাঁদিয়া উঠিল,—দীনু খুকীর শয্যার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। খুকীর রোগশীর্ণ পাণ্ডুর

মুখখানি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। তাহার শয্যার কাছে বসিতে বসিতে কুসুমের দিকে চাহিয়া কহিল, "ভয় কি ছোট মা? খুকু নিশ্চয়ই সেরে উঠ্‌বে, নারায়ণ মুখ তুলে চাইবেন"—দীনুর কথার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল,—যাহা কুসুমের বেদনাতুর হৃদয়কে কতকটা শান্ত করিল।

৭

সতীশ ও কুসুম চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই সুরেশের মুখের হাসিটুকু একেবারে নিভিয়া গেল। কোনও কাজে আর তাহার উৎসাহ ছিল না। সর্ব্বদাই বিমর্ষভাবে থাকিত।

সুকুমারী এটুকু লক্ষ্য করিল। সুরেশ কিছু স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও, সুকুমারী বুঝিল, একটা গুরু আঘাত পাইয়া তাহার অন্তরদেশ বেদনাতুর হইয়া রহিয়াছে। সে সেই বেদনাতুর স্থানটি কাহাকেও দেখাইতে চাহে না, গোপন করিয়াই রাখিতে চাহে। এমন কি সুকুমারীকেও সে কোনও দিন কিছু মুখ ফুটিয়া বলে নাই।

সুকুমারীর মনে হইতে লাগিল, সব অপরাধ যেন তাহারই। যে সংসার সহজ সরল গতিতেই চলিতেছিল, সেই যেন তাহার মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া এমনই করিয়া একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে! কুসুমকে যদি সে অম্লানবদনে সংসারের কর্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত, তাহা হইলে ত আর এমনটা ঘটিত না! কুসুম যদি সংসারের কর্ত্রী হইয়াই সুখী হইত, তাহা হইলে সে কেন তাহাকে সেই আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ হইতে বঞ্চিত

করিয়াছিল ? সংসারের মধ্যে কোনও গোলই ঘটিত না, যদি সে আগেই একটু বুঝিয়া চলিতে পারিত। আজ যে সে তাহার স্বামীর বিমর্ষ মুখ দেখিতেছে, এ ত তাহাকে দেখিতে হইত না ? যাঁহার পায়ে কাঁটাটি ফুটিলে সে দাঁতে তুলিয়া দিতে পারে, যিনি হাঁটিয়া গেলে পথের উপর বুক পাতিয়া দিতে তাহার সাধ হয়, আজ কতদিন সে তাঁহারই বিষণ্ণমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছে ! হায়, এমনটা ঘটিবার পূর্ব্বে সে মরিল না কেন ?

স্বামী ত তাহার কাছে কোনও কথাই জিজ্ঞাসা করেন না, সতীশের প্রসঙ্গ ভ্রমেও উল্লেখ করেন না ; তবে যদি তিনি তাহাকেই দোষী মনে করিয়া থাকেন।

সুকুমারীর হঠাৎ মনে হইল, নিশ্চয়ই তাহাই,—স্বামী তাহাকেই এ ব্যাপারে দোষী মনে করিয়াছেন বলিয়াই, তিনি সর্ব্বদা এমন বিমর্ষ, এবং তাহার কাছে সতীশ ও কুসুমের কোনও কথাই উল্লেখ করেন না।

দিনের পর দিন সুকুমারী যতই সুরেশের বিমর্ষমুখ দেখিতে লাগিল, ততই সে এই ব্যাপারের সম্পূর্ণ দায়িত্বটা নিজের উপরেই চাপাইতে লাগিল ; ক্রমেই সে যেন পরিষ্কার বুঝিতেছিল যে, সব অপরাধই তাহার, সেই কুসুমের অধিকার সঙ্কুচিত করিয়াছে, সেই সকল অমঙ্গলকে ডাকিয়া আনিয়াছে, সেই ভাইদের মধ্যে এই বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে ; সংসারের মধ্যে এতটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছে।

হায় ! সমস্ত অপরাধের শাস্তি সে একাই বহন করিয়া যদি স্বামীর মুখে হাসি ফুটাইতে পারিত !

সেদিন সুরেশ শুইবার পূর্ব্বে টেবিলের কাছে বসিয়া অন্যমনস্ক-ভাবে একখানা বইয়ের পাতা উল্‌টাইতেছিল, সুকুমারী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরেশ তাহার দিকে চাহিল না, কোনও কথাও কহিল না! সুকুমারীর চোখে জল আসিতেছিল, কিন্তু সুরেশ ত সে জল দেখিল না, কাছে ডাকিয়া, আদর করিয়া চক্ষু মুছাইয়া দিয়া, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল না!

সুকুমারীর বুকের মধ্যে বড় কেমন করিতেছিল; সে সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু স্বামী যে তাহাকে কাছে ডাকিবেন না, আদর করিবেন না, কথা কহিবেন না,—এটা সে কোনও ক্রমেই সহ্য করিতে পারে না! সুকুমারী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিয়াই হউক্ সে এই বিষাদ কালিমা দূর করিবেই।

হঠাৎ সুরেশের কাছে আসিয়া সুকুমারী ধীরে ধীরে কহিল, "আবার কি করিলে তেমনটি হয়?"—সুরেশ একটু চমকিয়া উঠিল, সে সুকুমারীর আগমন লক্ষ্য করে নাই।

"কি তেমন হয়, সুকু?"—স্বামীর উত্তরের মধ্যে সে এমন কিছু পাইল না, যাহাতে সে মনে করিতে পারে, যে তিনি তাহার উপর বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট।

"কি করিলে তোমার মুখে হাসি ফুটে, সংসারের সব গোল মিটিয়া যায়?"—সুরেশ ধীরে ধীরে তাহার শান্ত দৃষ্টিটুকু উৎসারিত করিয়া সুকুমারীর মুখের উপর স্থাপন করিল। দেখিল, তাহার নয়নে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে! সুকুমারীকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া সুরেশ কহিল, "তা জানিনা সুকু! এতটুকুও

অপরাধ আমাদের আছে কিনা আমি শুধু তাহাই ভাবি ;—যদি আমাদের কোনও অপরাধই না থাকে, যেমনটি ছিল আবার তেমনটি হওয়া অসম্ভব নয়, সুকু !"

বহুদিন পরে আজ স্বামীর মুখে এত কথা শুনিয়া সুকুমারী মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে ডাকিল ; অন্তরের মধ্যে যে অভিমান স্রোত এত দিন রুদ্ধ হইয়াছিল, আজ তাহার উৎস-মুখ বাধামুক্ত হইয়া গেল। সুকুমারী স্বামীর বুকের কাছে মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। সুরেশ বাধা দিল না, কথা কহিল না ; শুধু তাহার চুলের রাশির মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিল !

৮

দীনুকে সতীশের কর্ম্মস্থলে পাঠাইয়া দিবার সপ্তাহ পরে যখন সে ফিরিয়া আসিল না বা কোনও সংবাদও দিল না, তখন সুকুমারী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিল ! সুকুমারীর মনে হইল মানিনী কুসুম ফিরিবে না ; দীনুকে কিছু দিনের জন্য সেখানে রাখিয়াছে মাত্র। আরও তিন দিন কাটিল ; তবুও যখন দীনু ফিরিল না, তখন সুকুমারী বিপদাশঙ্কা করিয়া অস্থির হইয়া উঠিল !

দুপুর বেলা সুরেশ যখন শুইয়া পড়িয়া খবরের কাগজের পাতার উপর চক্ষু বুলাইতেছিল, তখন সুকুমারী আসিয়া কহিল, "একটা কথা বল্‌ব,"—খবরের কাগজ সরাইয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া সুরেশ কহিল, "কি ?"—

"আমি ত তোমার কাকাকে সেখানে পাঠাইয়াছিলাম"—

"হুঁ"—

"কোনও খবর ত পাওয়া গেল না।—মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠেছে।"—

"কি কর্‌বে? উপায় কি?"

"আমি একটা কথা বল্‌ব?"

"কি?"—

"যদি আমার কোনও অপরাধ থাকে"—

"তোমার একার অপরাধ বল কেন, সুকু? অপরাধ যদি কিছু থাকে,—তবে তা' দুজনেরই"—

সুরেশের কথা শুনিয়া সুকুমারী একবার চক্ষু মুদ্রিত করিল, মনে মনে কহিল, "দাসীর উপর তোমার এতই অনুগ্রহ, প্রিয়তম!"—

"তা' সেখানে একবারটি গেলে সে অপরাধের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হ'তে পারে,—তোমার যদি ইচ্ছা হয়"—

সুরেশ দুই হাতে সুকুমারীর পরম সুন্দর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "তোমার ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছার পার্থক্য ত কোনও দিনই করি নাই, সুকু"—

সুকুমারীর লজ্জারক্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া সুরেশের মনে হইতেছিল, যেন সুকুমারীর মুখখানি এত সুন্দর সে আর কোনও দিনই দেখে নাই!

সুরেশের দৃষ্টির নিম্নে সুকুমারীর প্রথম বধূজীবনের সরম ও

কুণ্ঠা ফিরিয়া আসিতেছিল, সে চক্ষু বুজিয়া স্বামীর বুকে আবার মুখ লুকাই !

সেই দিন রাত্রির গাড়ীতেই সুরেশ ও সুকুমারী সতীশের বাসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল !

ভোরে সুরেশের গাড়ী বাসার দরজায় থামিল ! সুরেশ কড়া নাড়িতেই একটা ঝি আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল !

সুরেশ ও সুকুমারী সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। সিঁড়ির পাশেই একটা ঘর। দুয়ারটা ঈষৎ উন্মুক্ত রহিয়াছে। ঘরের মধ্যে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। সুরেশ দেখিল, দীনু একটা বরফের (Ice bag) ব্যাগের মধ্যে টুক্‌রা করিয়া বরফ রাখিতেছে, সতীশ একটা ঈজি চেয়ারের উপর অৰ্দ্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে ! নীচের বিছানার উপর খুকী শায়িত। তাহার পর্শ্বে অশ্রুমুখী কুসুম নিমেষশূন্য নয়নে খুকীর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

দুয়ার ঠেলিয়া, সুকুমারী কক্ষ মধ্যে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া খুকীর শয্যা পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। দীনু মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া কহিল,—

"কে—বড় মা ! এসেছ, বড় ভাল হয়েছে,"—

দীনুর কথা শুনিয়া কুসুম মুখ তুলিল; সতীশ চক্ষু খুলিয়া চাহিল। বিস্মিতা কুসুম কথা কহিবার পূর্ব্বেই সুকুমারী খুকীর শিয়রে বসিয়া পড়িল, কহিল,—"কুসি, খুকুর এমন অসুখ যে আমাকেও জানাতে সময় পাস্‌নি !—আহা, বাছা আমার যে বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে !"

কুসুম মুহূর্ত্তকাল বিস্মিত দৃষ্টিতে সুকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর তাহার দুই পায়ের উপর মাথা গুঁজিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "দিদি, সব ভুলে গিয়ে তুমি যে নিজেই খুকুকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছ, তা'তেই মনে হচ্ছে,—আমার পাপের বুঝি প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। দিদি, বল, তুমি শুধু খুকুর জন্যেই আসনি, তোমার ছোট বোন্‌কেও ক্ষমা করেছ !"—

সুকুমারী কুসুমকে টানিয়া তুলিয়া তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিল, "দূর পাগ্‌লী ! আমি ত কোনও দিনই তোর উপর রাগ করিনি,—আমার নিজের উপরই বরং রাগ হচ্ছিল, যে আমি কেন আরও আগে আসিনি ! তা হ'লে, ত আর তুই খুকুকে নিয়ে এমন অস্থির হ'য়ে উঠ্‌তিস্ না !"—

সতীশ ঈজি চেয়ারের উপর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিতে পাইল, দুয়ারের কাছে সুরেশ দণ্ডায়মান রহিয়াছে ; সে ছুটিয়া গিয়া সুরেশের প্রসারিত বাহুযুগলের মধ্যে আশ্রয় লইল।

আনন্দ ও তৃপ্তির আতিশয্যে আজ বহুদিন পরে দীনুর মুখশ্রী আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু তাহার অশ্রু কোনও মতেই বাধা না মানিয়া লোল কপোল প্লাবিত করিয়া নামিয়া আসিতেছিল !

এমন সময়ে খুকী সহজ ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল, "দাদু"—

দীনু তাহার শয্যাপার্শ্বে ছুটিয়া গেল !

জীবনারতি

১

সকালের ডাক আসিয়াছে। শচীন্দ্রনাথ ত্রস্ত-হস্তে একবার চিঠি ও কাগজ-পত্রগুলি উলটাইয়া দেখিতেছিল। একখানি ধূসর-বর্ণের সুদৃশ্য খাম তাহার দৃষ্টিতে পড়িল। খামের উপরে সুন্দর সাজান মোটা মোটা ইংরাজী অক্ষরে শচীন্দ্রনাথের নামটি লিখিত। লিখাটি সম্পূর্ণ অপরিচিত। শচীন্দ্রের সন্দেহ হইল লিখাটা পুরুষের নহে।

কাহার লিখা?

শচীন্দ্রনাথের অন্তরমধ্যে একটা নীরব প্রশ্ন সাড়া দিতেছিল। খানিকক্ষণ চিঠিখানি এ পিঠ ও পিঠ করিয়া, শচীন্দ্র ধীরে ধীরে খামটা পাশ দিয়া নিপুণ হস্তে ছিঁড়িয়া ফেলিল; তাহার পর চিঠি বাহির করিয়া পড়িল।

চিঠি পড়ার পর তাহার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। চিঠিতে লেখিকার নাম ছিল না। একটি ভাবপ্রবণ কোমল হৃদয়ের অভিব্যক্তিতে চিঠিখানি পরিপূর্ণ। যে চিঠি লিখিয়াছে, সে যে নারী, তাহা চিঠির আন্তরিকতাপূর্ণ কোমল ভাষা ও লিখনভঙ্গীটিই প্রকাশ করিয়া দিতেছিল!

আজিকার সকালের ডাক শচীন্দ্রের কাছে যে অভিনন্দনবার্ত্তা

বহন করিয়া আনিয়াছে, শচীন্দ্র তাহা কোনও দিন স্বপ্নেও আশা করে নাই।

শচীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম হইতেই বিশেষত্ব লইয়া প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার মতামতগুলি, তাহার, নিজস্ব সতেজ, কুণ্ঠাশূন্য ভাষায় সে প্রথম দিন হইতেই প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। কবিতায় ও ছোট গল্পের মধ্যে সে তাহার উদ্দেশ্যকে এমনই করিয়া ফুটাইয়া তুলিত যে, তাহার লিখা পড়িলেই পাঠকের মনে হইত, চরিত্রগুলি কল্পিত নহে; সমাজের মধ্যে যাহারা চিরদিন প্রশ্রয় পাইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং সমাজকে তাহাদের অস্তিত্বদ্বারা ক্রমাগতই কুণ্ঠিত—দুষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, এ তাহাদেরই স্বরূপ চিত্র। এই লিখায় শুধু তাহাদিগকেই অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইয়া দেওয়া হইতেছে এবং লোককে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে। ব্যঙ্গে, হাস্যে, কৌতুকে তাহার রচনাগুলি উজ্জ্বল—চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিত,—অথচ কোথায়ও ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই। বহুযুগ ধরিয়া সমাজ যে সকল দোষকে মজ্জাগত করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলিকে ক্রমাগত টানিয়া বাহির করিয়া, সে সমাজের চক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিতে চাহিত। নিপুণ পরিদর্শকের চক্ষু লইয়া সে যাহা প্রত্যক্ষ করিত, শুধু সেইগুলিকেই সে সাধারণ পাঠকের বিচারবুদ্ধির নিকট আনিয়া উপস্থিত করিত। কল্পনার অতিরঞ্জনে সে তাহার চিত্রগুলিকে কোনও দিনই অবাস্তব করিয়া তুলিতে চাহে নাই। শচীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, মুখের শাসনবাণীতে পরিবার শাসিত হয়; কিন্তু যখন

বিস্তৃত সমাজ-পরিবারকে শাসন করিতে হইবে, তখনই সাহিত্যের প্রয়োজন। সাহিত্য এক দিকে যেমন সমাজকে সংগঠিত করিয়া তুলিবে, অন্যদিকে তেমনই সমাজকে তাহার প্রত্যেক দোষের বিষয়ে সাবধান, সতর্ক করিয়া দিবে।

মানুষ সংযমের পথ দিয়া ধীরে ধীরে কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইবে,—শুধু বিলাস-রঙ্গের মধ্য দিয়া জীবনকে ও জীবনের উদ্দেশ্যকে সার্থকতার অভিমুখে লইয়া যাওয়া অসম্ভব। এই মতটিও তাহার চিন্তা ও কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল।

আজিকার ডাকে যে অভিনব চিঠিখানি আসিয়াছিল, সে চিঠি তাহার মতেরই সমর্থন করিয়াছে এবং বিলাসকে কুণ্ঠিত করিয়া সে যে সহজ, সরল, তৃপ্ত জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া এত দিন দেখাইয়া আসিয়াছে, সেই জীবন-নির্ব্বাহ প্রণালীকেই লেখিকা অভিনন্দন করিয়াছেন। শচীন্দ্রনাথের কাছে এই লিপিখানি অনেকটা তৃপ্তি ও গৌরব বহন করিয়া আনিয়াছিল। সে তৃপ্তি ও গৌরব তাহাকে উৎফুল্ল না করিলেও একটি নির্ম্মল পুলকধারায় তাহার অন্তরকে অভিসিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছিল।

সমস্ত দিনের নানা কার্য্যের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ কোনও মতেই এই চিঠিখানির কথা ভুলিতে পারিতেছিল না। চিঠিখানির অন্তরাল দিয়া এক মহিমমণ্ডিতা নারীর সৌন্দর্য্যোদ্ভাসিত মূর্ত্তিখানি তাহার কল্পনা-পুলকিত নয়নের কাছে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে কে,—কিরূপ তাহার শিক্ষা,—কেমন তাহার রূপ,—কি নাম তাহার,—কিছুই ত শচীন্দ্র জানে না। হাতের লিখার ছন্দের মধ্য দিয়া

তবুও যেন সেই নারীর কঙ্কণজড়িত শুভ্র হস্তখানি শচীন্দ্রের কল্পনা-কুহেলিকাবৃত নয়নের কাছে ধরা দিতেছিল। লিখার ছন্দের মধ্যে নাকি মানুষের অন্তর-প্রকৃতি প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত এই তথ্যটি শচীন্দ্রনাথের কাছে আর মিথ্যা বলিয়া মনে হইল না। অক্ষরগুলির প্রত্যেক অঙ্কনরেখার মধ্য দিয়া, ভাষার সরল মধুর অভিব্যক্তিতে সে যেন সেই অপরিচিতার অন্তরের সংবাদ অনেকটা পাইতেছিল।

২

শচীন্দ্রনাথ এতদিন অনাড়ম্বর শান্ত পল্লীজীবন অতিবাহিত করিতেছিল; আজ হঠাৎ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তাহার আহ্বান আসিল। মাসিক পত্র 'কল্যাণী'তেই এতদিন সে তাহার অধিকাংশ রচনা দিয়া আসিয়াছিল। 'কল্যাণী'র প্রৌঢ় সম্পাদক শচীন্দ্রনাথকে বহুদিন হইতে সহকারিরূপে পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। সংসারে শচীন্দ্রনাথের একমাত্র বৃদ্ধা জননী ও একটি কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। ভগিনীর বিবাহান্তে শচীন্দ্রনাথ জননীর সেবাকেই জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যরূপে বৃত করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং এত দিন বাহিরের কোনও আহ্বানই তাহাকে টলাইতে পারে নাই। সম্প্রতি জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; পল্লীগ্রামে শচীন্দ্রের আর বিশেষ কোনও বন্ধনই ছিল না। বিষয়-সম্পত্তি যাহা ছিল, পুরাতন বিশ্বাসী নায়েব হরিহর বাবুর উপর তাহার ভার দিয়া শচীন্দ্রনাথ পরম নিশ্চিন্ততার সহিত কল্পনা-লক্ষ্মীর বরাঙ্গ-প্রসাধনে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু 'কল্যাণী' সম্পাদক

রাখাল বাবু এই সংবাদ শুনিলেন ; এবার আর তিনি শচীন্দ্রকে ছাড়িলেন না।

শান্ত পল্লীজীবনের মায়া কাটাইয়া কিছু কালের জন্য তাহাকে কলিকাতায় কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িতেই হইল।

গঙ্গার ধারে ছোট একখানি একতল বাসা ভাড়া করিয়া শচীন্দ্রনাথ "ঠাকুর" চাকরের উপর গৃহস্থালীর সম্পূর্ণ ভার অর্পিত করিল এবং পরদিনই একরাশি পুস্তক ও কতকগুলি ছবি খরিদ করিয়া আনিয়া নিজের পাঠাগার সুসজ্জিত করিতে লাগিয়া গেল। "ঠাকুর" ও চাকর সে সঙ্গে করিয়া দেশ হইতেই আনিয়াছিল, সুতরাং গৃহস্থালীর বন্দোবস্তের জন্য শচীন্দ্রনাথের আর কোনও প্রকার উদ্বেগই রহিল না।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা শচীন্দ্রনাথ রাখাল বাবুর বাসায় দেখা করিতে গেল। রাখাল বাবু তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ছোট একটি কক্ষে বসিয়া রাখালবাবু লিখিতেছিলেন, এমন সময় শচীন্দ্রের কার্ড বহন করিয়া উড়িয়া চাকরটি গৃহে প্রবেশ করিল। রাখাল বাবু নিজেই উঠিয়া গেলেন এবং সাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন।

রাখাল বাবু প্রৌঢ় ; শচীন্দ্রনাথ বাইশ বৎসরের যুবক। ইতঃপূর্ব্বে কোনও দিন উভয়ের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে দেখা-শুনা হয় নাই। শচীন্দ্রনাথের রচনায় কল্পনা ও ভাবের পরিণতি এবং শৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয়া রাখাল বাবু তাহাকে আর একটু অধিক বয়স্ক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

"কখন এলেন আপনি ?"—স্মিত হাস্যে রাখালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আমায় 'তুমি' বল্‌বেন।—পরশু সকালে এসেছি ; একেবারে বাসাটা ঠিক ক'রে রেখেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।" —শচীন্দ্রনাথ তাহার স্বভাবসুলভ প্রফুল্লতার সহিত কথা কয়টি বলিয়া গেল।

রাখাল বাবু শচীন্দ্রনাথের উত্তর দিবার প্রণালীতে এবং তাহার সরল, উদার স্মিতহাস্যটুকুর মধ্যে এমন কিছু দেখিতে পাইলেন, যাহা এই প্রথম আলাপেই তাঁহার হৃদয়স্থিত স্নেহ-উৎসের মুখে যাইয়া আঘাত করিল।—"পরশু এলে, আর আজ বুঝি আমি দেখা পেলাম ?"

শচীন্দ্র রাখাল বাবুর কথা শুনিয়া একটু হাসিল। উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কক্ষে আর একজন প্রবেশ করিল ; সে রাখাল বাবুর একমাত্র কন্যা কল্যাণী।

রাখাল বাবু কন্যার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "মা, ইনি শচীন্দ্র বাবু, ইহাকে নমস্কার কর।"

কল্যাণী নমস্কার করিবার পূর্ব্বেই শচীন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দুই পাণি যুক্ত করিয়া ললাটের একটু কাছে লইল, তাহার পর আবার বসিয়া পড়িল।

কল্যাণীও যথারীতি একটি ছোট রকমের নমস্কার করিল।

কল্যাণী ভাবিল, শচীন্দ্র অতিথি ; তাহার পক্ষে প্রথম কথা আরম্ভ করা অশোভন হইবে না। সে একবার তাহার নত চক্ষু

তুলিয়া শচীন্দ্রের মুখের উপর স্থাপিত করিল, মৃদু-কণ্ঠে কহিল, "পল্লী ছেড়ে কলিকাতা আপনার কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করেছেন দেখে সুখী হলেম"—কথা বলিয়াই কল্যাণী আবার তাহার চক্ষু নত করিয়া লইল।

কল্যাণীর বুকের মধ্যে যেন বড় কাঁপিতেছিল; কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে ভাবিল, কথাটা 'খাপ ছাড়া' হয় নাই ত?

শচীন্দ্র একটু হাসিল, কহিল, "কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করাটা খুবই সহজ, কিন্তু দেখ্‌তে হ'বে, সে ক্ষেত্রের উপযুক্ত কর্ষণ হয় কি না, ক্ষেত্র আশানুরূপ ফল বহন করে কি না।"

উত্তর শুনিয়া কল্যাণী একটু আরাম বোধ করিল। তাহার অন্তরমধ্যে যে একটা কুণ্ঠার ভাব আসিতেছিল, সেটুকু কতক পরিমাণে কাটিয়া গেল। প্রথম আলাপের সূত্রপাতেই যে কৃত্রিমতার আবরণ দিয়া আপনাকে ঢাকিতে চাহে না, স্বচ্ছ দর্পণের উপর ছায়াপাতের ন্যায়, আলাপের ভঙ্গীর মধ্যে নিজের প্রকৃতির একটা স্বরূপ প্রতিবিম্ব দেখাইয়া দেয়, তাহার সহিত আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা এক দিনে এক মুহূর্ত্তেই স্থাপিত হইতে পারে।

রাখাল বাবু লিখিতেছিলেন; শচীন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া কহিলেন, "কৃষক ভাল হইলে অনুর্ব্বর ক্ষেত্রেও ফসল ফলে।"

কল্যাণী দেখিল, সেই উন্নতদেহ যুবা এক মুহূর্ত্তেই পিতার হৃদয়ে খানিকটা স্থান অধিকৃত করিয়া লইয়াছে। তাহার সরল সুগঠিত দেহ, উন্নত ললাট, বিশাল চক্ষুর্দ্বয়ের স্বপ্নময় দৃষ্টিটুকু, তাহাকে এক অনির্ব্বচনীয় মহিমায় মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল।

সে চক্ষুর দৃষ্টি সহ্য করা খুব কঠিন নহে। শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে, মধুরতায় পরিপূর্ণ সেই অনাবিল কুণ্ঠাশূন্য দৃষ্টিটুকু!

বাহিরে কি একটু কাজ ছিল, রাখাল বাবু উঠিয়া যাইতে যাইতে কহিলেন, "মা, তুমি শচীন্ বাবুর সঙ্গে আলাপ কর, আমি এখনই ফিরিয়া আসিব।"

চিত্রাঙ্গদা কোন্ এক মধুর বসন্ত প্রভাতে মুকুলিত কুঞ্জবন পথে পার্থের সম্মুখে তাহার বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল: সে যে নারী, সর্ব্বপ্রথম তাহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া ব্রীড়া-কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়াছিল। কল্যাণী চাহিয়া দেখিল সেই ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যেও এমন একজন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে আসীন রহিয়াছেন, যাঁহার স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবটি নারীকে অভ্রান্ত-ভাবে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, সে নারী।

কল্যাণী এমন করিয়া আর কাহারও সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের দিকে চাহিয়া দেখে নাই; তাহার নারী-প্রকৃতি এমন করিয়া আর কাহারও কাছে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে নাই। কল্যাণী কি কহিবে, স্থির করিতে পারিতেছিল না; এমন সময়ে শচীন্দ্র কহিল, "একেবারে পল্লীসমাজ ছেড়ে এখানে এসে পড়েছি, অনেক সময়ে হয় ত অসুবিধা সৃষ্টি ক'রে তুল্‌ব।"

"হয় ত সহরের সমাজ আপনাকে ততটা তৃপ্তি দিতে পার্‌বে না"—কল্যাণী মৃদুকণ্ঠে কথা কয়টি বলিল।

"প্রত্যেক সমাজের মধ্যে যেটুকু মন্দ, তাহা চিরদিনই পীড়া প্রদান করিবে; যেটুকু ভাল, তৃপ্তি তাহার মধ্যেই পাওয়া যাইতে

পারে ; সহরের ও পল্লীর সমাজ উভয়ই মানুষের সমাজ ; ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণেই এই মনুষ্য সমাজ গঠিত, কোনও সমাজই নিরবচ্ছিন্নভাবে ভাল বা মন্দ নহে, সুতরাং পল্লীর সমাজে যে দোষযুক্ত অংশটুকু লক্ষ্য করিয়াছি, এখানে তাহা দোষবিমুক্ত দেখিতে পারি ; আবার, পল্লীসমাজের মধ্যে যে সারল্য, নিষ্ঠা ও মাধুর্য্য দেখিয়াছি, এখানে তাহার অভাব অনুভব করিতেও পারি।"—শচীন্দ্র একাগ্রভাবে কথাগুলি বলিয়া যাইতেছিল। কল্যাণী দেখিল, এই নবাগত তাহার মতকে প্রথম হইতেই একটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া উপস্থিত করিতে পারে।

এমন সময়ে রাখাল বাবু ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আর একজন যুবক আসিয়াছিল।

"শচীন বাবু, তোমাকে আমি নীপেশ বাবুর সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিতেছি ইনি"—রাখাল বাবুর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শচীন্দ্র উঠিয়া অগ্রসর হইয়া যাইয়া নমস্কার করিল এবং কহিল, "নীপেশ বাবুর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না তবে নীপেশ বাবুর কবিতাগুলি আমি আগ্রহের সঙ্গেই পড়িয়াছি।—আজ আপনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া সুখী হইলাম।"

নীপেশ প্রতি-নমস্কার করিল এবং সামান্য দুই একটি কথায় তাহার সম্ভাষণ শেষ করিয়া দিল।

নীপেশ তাহার বুকের মধ্যে কেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছিল।

তাহার এই অনুৎসাহের ভাবটুকু কল্যাণী লক্ষ্য করিল। ইহার

পর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে নীপেশের মুখের দিকে চাহিল। সেই তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিপাতে বুদ্ধিমতী কল্যাণী যেন তাহার অন্তর পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া লইল।

হঠাৎ নীপেশ কল্যাণীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, সে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে ;—তাহার যুগ্মভ্রূ কুঞ্চিত ; দৃষ্টিতে বিরক্তিপূর্ণ অনুসন্ধিৎসার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নীপেশ মনে মনে ভাবিল, এ বিরক্তিভাব কেন ? কল্যাণীর কাছে তাহার মনোভাব সে যে লুকাইতে পারে নাই, ইহা সে বুঝিল ; বুঝিয়া একটু সুখীও হইল। কিন্তু কল্যাণীর বিরক্তিপূর্ণ ভাবটুকুর বিশ্লেষণ করিয়া সে যাহা পাইল, তাহা তাহার পক্ষে কোনও ক্রমেই তৃপ্তিপ্রদ হইল না।

নীপেশ বলিয়া উঠিল ; "তা' হ'লে আপনারা বসুন। আমি আসি। একটু বিশেষ কাজ আছে।" বিদায়-নমস্কার করিয়া নীপেশ বাহির হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন গর্ব্বিত কল্যাণীর সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখনও তাহার অনুসরণ করিতেছে।

কল্যাণী মনে মনে ভাবিল, "ছিঃ, নীপেশ বাবু, এত দুর্ব্বলতা তোমার !"

রাখাল বাবু কল্যাণীর দিকে ফিরিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, "নীপেশকে একটু কেমন দেখিলাম, ওর অসুখ করে নাই ত ?"

কল্যাণী উত্তর দিল না।

প্রৌঢ় রাখাল বাবুর স্নেহদৃষ্টির নিকট যাহা ধরা পড়ে নাই, তাহা কল্যাণীর নারীচক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই।

এবার শচীন্দ্র উঠিল, পিতাপুত্রীর নিকট বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিল।

৩

শচীন্দ্রের কলিকাতায় আসিবার পর প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে।

বেলা প্রায় নয়টা। পিয়ন একখানি ধূসরবর্ণের খাম চিঠির বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দিল! শচীন্দ্র নিকটে আসিয়া বাক্স খুলিয়া চিঠি বাহির করিল। প্রত্যেক মাসের এই দিনটি শচীন্দ্রের ব্যর্থ যায় না; তাহাকে অভিনন্দন করিয়া এই লিপি প্রতি মাসেই এক-খানি করিয়া আসিতেছে।

কে এই নারী?—এই লিপি-প্রেরিকা?

রমণী যে-ই হউক, সে যে শচীন্দ্রের সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান রাখে, তাহাতে তাহার এতটুকুও সন্দেহ ছিল না। সম্রাটের কোষাগারে রাজস্ব যেমন ঠিক নিয়মিত সময়ে আসিয়া পৌঁছে, এই অযাচিত অভিনন্দন-লিপি পাইয়া শচীন্দ্রের মনে হইত, ইহাও যেন, রাজস্বের মত, তাহার একটি ন্যায্য প্রাপ্য। তাহা নিরূপিত সময়ে আসিয়া পৌঁছিবেই।

বসন্ত-সমাগমে পল্লবশীর্ষে নবপত্রোদ্‌গমের ন্যায় প্রতি মাসেই এই ধূসরচ্ছদাবৃত লিপিখানি দেখা দিত। জীবনের অনেক পরীক্ষার মধ্যে, অনেক নিরাশার মধ্যে এই লিপিখানি তাহার কাছে উৎসাহবাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। এ যেন তাহার জীবনের সমগ্র সুখ ও দুঃখের অনুভূতির সহিত একান্তভাবে জড়িত হইয়া

গিয়াছে। যখনই সে তাহার হৃদয়ের মধ্যে দৈন্য অনুভব করিয়াছে, যখনই আঘাত পাইয়া তাহার অন্তর কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে, তখনই আশায়, বিশ্বাসে, উৎসাহে প্রদীপ্ত এই লিপিখানি তাহার কাছে একটি নিশ্চিত সান্ত্বনা বহন করিয়া আনিয়াছে।

মাটির নীচে যে চিরন্তন রসধারা প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, উপরে থাকিয়া কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। শচীন্দ্রনাথ জানিত না, কে এই লিপি-প্রেরিকা, কিন্তু তবুও এই অনির্দ্দিষ্টা নারীর উদ্দেশ্যে তাহার অন্তরে এক আবেগ-পুলকিত আকর্ষণ স্রোতঃ অন্যের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সূচনায় শচীন্দ্রও তাহা বুঝিতে পারে নাই, কি নামে তাহার এই আকর্ষণকে সে অভিহিত করিবে ?

এ কি প্রেম ?

যে আকর্ষণের অনুভূতি,—স্মরণ, তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলে, সতর্ক করিয়া দেয়, অনন্যমনা করিয়া রাখে,—সে কি ? সে কি সেই বিশ্ব-বিপ্লাবী প্রেম ?

শচীন্দ্রনাথ সেই লিপিখানি পাঠ করিয়া গেল। একবার পড়িয়া সে আর তৃপ্তি পায় না। সে দিন গিয়াছে, যখন সে এই লিপিকে শুধু একটি মূঢ়—ভক্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধাবিনত ভক্তিনিবেদন বলিয়াই মনে করিত। কোন্ এক নিপুণ শিল্পী মর্ম্মর-প্রতিমা গঠিত করিয়া, সেই প্রতিমাকেই তাহার নিষ্ঠ প্রেমাভিষেচনে প্রাণময়ী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। এখন আর সে কাহিনী শচীন্দ্রনাথের কাছে কল্পনার মোহিনী সৃষ্টি বলিয়া মনে হইত না।

তাহার জীবনের সমস্ত আবেগ, সমস্ত কল্পনা, সমস্ত সুখ ও দুঃখের অনুভূতি শুধু এই মুগ্ধ লিপিখানিকে বেষ্টিত করিয়া ফিরিতেছিল! তাহার মর্ম্মতন্ত্রীতে একটি অননুভূতপূর্ব্ব পুলকগুঞ্জন নিশিদিনই মৃদুভাবে বাজিতেছিল, সেই গুঞ্জনকে, সেই অনুভূতিকে সে আর কোনও মতেই অস্বীকার করিতে পারিতেছিল না।

৪

সে দিন সন্ধ্যায় নীপেশ আসিয়া দেখিল, রাখালবাবু কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছেন। কল্যাণী খালি বাসায় টেবলের কাছে দাঁড়াইয়া একখানি বহির পাতা উল্‌টাইতেছে।

নীপেশ কাছে আসিল, কহিল, "বাসায় একা আপনি?"

কথাটা বলিবার সময় নীপেশের কণ্ঠস্বর বুঝি একটু কাঁপিয়াছিল। অন্যমনস্কা কল্যাণী তাহা লক্ষ্য না করিয়া উত্তর দিল, "বাবা বাহিরে গিয়াছেন।"—সাদর অভ্যর্থনার কোনও ভঙ্গী কল্যাণীর এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটির মধ্যে নীপেশ খুঁজিয়া পাইল না।

কল্যাণী সম্মুখের পুস্তকখানির পাতাই উল্‌টাইতেছিল; নীপেশ একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিল। মুখ দেখিয়া নীপেশ বুঝিল, কল্যাণী অন্যমনস্কা।

আলাপটাকে সতেজ রাখিবার জন্য সে কথা খুঁজিয়া পাইতেছিল না, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কি বই ওখানা?"

"শচীন্দ্র বাবুর 'দীপিকা'।"—শচীন্দ্রের নামটি উচ্চারিত করিবার সময় কল্যাণীর বুকের মধ্যে দ্রুততর তালে একটা রক্তের

ঝলক প্রবাহিত হইয়া গেল। স্বর না কাঁপিয়া যায়, দুর্ব্বলতা ধরা না পড়ে, এ জন্য কল্যাণী একটু অতিরিক্ত জোর দিয়াই শচীন্দ্রের নাম উচ্চারিত করিয়া ফেলিল।

তাহার নিজের উচ্চারিত নাম তাহার কাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্তরে একটা মোহস্বপ্ন রচিত করিয়া তুলিল। মোহ-স্বপ্নাবিষ্টা কল্যাণী কুণ্ঠাচকিত-দৃষ্টিতে নীপেশের দিকে একবার চাহিল। নীপেশও যে একটু বিস্মিত হইয়াছে, তাহা সে বুঝিল। কল্যাণী তাহার দৃষ্টি নত করিয়া লইল।

নীপেশ একটু উদাসভাবে হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "দেখি বহিখানি।"

কল্যাণী তাহার এই উদাসভাবটুকু লক্ষ্য করিল, তাহার অন্তরে একটা বিদ্রোহ ও বিরক্তির ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। সে আত্ম-সম্বরণ করিয়া লইয়া বহিখানি নীপেশের দিকে একটু ঠেলিয়া দিল। টেবলের উপর হইতে বহি তুলিয়া লইয়া পুষ্ট বহিরাবরণটা উল্‌টাইতেই নীপেশ দেখিল, ভিতরে উজ্জ্বল সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে,—"শ্রীমতী কল্যাণী দেবীকে প্রদত্ত হইল।"

নিম্নে শচীন্দ্রের সাঙ্কেতিক নামাক্ষর! নীপেশের মনে হইল, এই একটি ছত্র আড়ম্বরশূন্য লিখার মধ্যে অনেকটা ঘনিষ্ঠতার সঙ্কেত লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই লিখাটুকুকে সে কোন মতেই সহজ, সরল ভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না।

কল্যাণীকে এমন ভাবে উপহার দিবার কি অধিকার শচীন্দ্র-নাথের থাকিতে পারে, এই প্রশ্নটাই বারংবার নীপেশের অন্তর-

মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিয়া সাড়া দিতে লাগিল! কিন্তু সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবারই বা নীপেশের কি অধিকার আছে?

এই দীর্ঘকালের পরিচয়ের মধ্যে যে অধিকার-সীমাকে নীপেশ মনে মনে ক্রমাগতই বাড়াইয়া দিয়াছে, আজ হঠাৎ শচীন্দ্রের তুচ্ছ এক ছত্র লিখা, সম্রাটের আদেশের মত অতর্কিত-ভাবে আসিয়া পড়িয়া, সেই অধিকার-সীমাকে একেবারেই সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিতে চাহিল। নীপেশ একবার মনে করিল, হয় ত এ সবই তাহার শঙ্কিত সন্দেহাকুল চিত্তের মিথ্যা কল্পনা; কোনও সত্যই ইহার মূলে নিহিত নাই। কিন্তু প্রবল শক্তির আক্রমণ কল্পনা করিয়া, বিরাট সংগ্রামের নিস্ফল আয়োজন প্রত্যেক শক্তিই চির-দিন করিয়া আসিতেছে; নীপেশও বিদ্রোহ করিয়া, সংগ্রাম করিয়া আপনাকে জয়যুক্ত করিবে, এমনই একটা আয়োজন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। নীপেশ বহির পাতা উল্টাইতেছিল এবং চিন্তা করিতেছিল। কল্যাণী একটু সরিয়া একটা দেরাজের কাছে যাইয়া দাঁড়াইল।

নীপেশ চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কল্যাণী সরিয়া গিয়াছে, এবং শচীন্দ্রনাথ ও রাখাল বাবু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন।

"এই যে নীপেশ এখানেই"—রাখাল বাবু প্রশান্তভাবে কহিলেন।

"আমি প্রায় আধঘণ্টা হইল আসিয়াছি।" "আধঘণ্টা" কথাটার উপর নীপেশ একটু বিশেষ করিয়া জোর দিয়াছে, তাহা আর

কেহ লক্ষ্য না করিলেও, কল্যাণী লক্ষ্য করিল। তাহার কৃষ্ণতার নয়ন দুইটি মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলিয়া উঠিল।

"নমস্কার, নীপেশ বাবু!"—একটু অগ্রসর হইয়া শচীন্দ্র কহিল। নীপেশ এতক্ষণ কতকটা ইচ্ছা করিয়াই শচীন্দ্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু শচীন্দ্র যে প্রকৃতির লোক সে প্রকৃতির লোক নিজেকে কখনও অস্বীকৃত থাকিতে দিতে চাহে না!

নীপেশ প্রতি-নমস্কার করিল।

"কি বহি দেখিতেছ?"—রাখাল বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

"দীপিকা—শচীন্দ্রবাবুর—"

"দীপিকা আমার বেশ লাগিয়াছে,—শচীন্দ্রনাথের লিখা ক্রমেই আমাকে মুগ্ধ করিতেছে।"—রাখাল বাবু শচীন্দ্রের বিনয়নম্র মুখের দিকে চাহিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথাগুলি বলিলেন।

দেরাজের পাশ হইতে কল্যাণী চক্ষু তুলিয়া শচীন্দ্রের উজ্জ্বল মুখখানির দিকে চাহিল। তাহার প্রশংসমান চক্ষুর দৃষ্টি নীপেশের চক্ষু এড়াইল না।

নীপেশ কেন যে একটা অনির্দ্দিষ্ট তীব্র অন্তর্দ্দাহ অনুভব করিতেছিল, তাহা সে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তবু একটা কিছু উত্তর করা দরকার। নীপেশ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "'বসুন্ধরা' পত্রিকায় 'দীপিকার' যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছেন কি?"

নীপেশের কথা নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বেই দেরাজের পাশ হইতে কল্যাণী উত্তর দিল, "আমি পড়িয়াছি,—সে ধৃষ্টতাপূর্ণ সমালোচনের

জন্য 'চাবুক' প্রস্তুত হইতেছে।"—কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কল্যাণী বড় কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল। কল্যাণীর মনে হইল, কথাটা বড়ই রূঢ় ও শ্লেষপূর্ণ হইয়া গেল।

তীব্র সমালোচনার জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে 'কল্যাণী'র বেশ একটু নাম ছিল। নীপেশ বুঝিল, কে 'চাবুক' প্রস্তুত করিতেছে। 'বসুন্ধরা'য় সমালোচকের নাম ছিল না, তাই রক্ষা।

"তা' তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনা হওয়াটা এক প্রকার মন্দ নহে, সহজে বিখ্যাত হইয়া পড়া যায়।"—শচীন্দ্র কথা কয়টি এমন সুন্দর ভাবে হাস্যতরলকণ্ঠে বলিয়া গেল যে, কল্যাণীর কুণ্ঠা অনেকটা কমিয়া গেল এবং যে বিতর্কের সূচনা হইতেছিল, তাহাও কতকটা কাটিয়া গেল।

রাখাল বাবু ধীরে ধীরে তাঁহার কেশ-বিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "নীপেশ, তুমি কাল একবার আমার সঙ্গে দুপুরের পর দেখা করিলে সুবিধা হয়। সময় হইবে ত?"

"যে আজ্ঞে। দুইটার পর আপনার সময় হইবে ত?"

"তা হইবে, বেশী রৌদ্রে আসিও না, কষ্ট হইবে।"

কালিকার আসিবার বন্দোবস্ত হইয়া গেলে আজ আর বসিয়া থাকা চলে না; সুতরাং নীপেশ কহিল, "তবে আমি এখন উঠি, কাল দুইটার পরই আসিব।"

নীপেশ চলিয়া গেল।

রাখাল বাবু একটু ক্লান্তভাবে আরাম-কেদারার উপরেই শুইয়া পড়িলেন; কল্যাণীকে কহিলেন, "মা, একটা ছোট গান গাহিবে?"

ঘরের কোণে টেবিলের উপর একটা হার্ম্মোনিয়ম্ ছিল। কল্যাণী তথায় গিয়া পিতার আদেশ পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

শচীন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমি তবে বাসায় যাই, আপনারা বিশ্রাম করুন্।"

"না। সে কি? বস বাবা, কল্যাণীর গানটা শুনিয়া যাইতে আপত্তি আছে কি?"—রাখালবাবু সস্নেহে কথাগুলি বলিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে কল্যাণী আর কোনও দিন শচীন্দ্রের সাক্ষাতে গান করে নাই; আজই প্রথম গাহিবে। কল্যাণী সঙ্কোচ বোধ করিবে মনে করিয়া শচীন্দ্র উঠিতে চাহিতেছিল।

এখন অনুরুদ্ধ হইয়া শচীন্দ্র বসিল। কল্যাণী বন্ধুবান্ধবদিগের সম্মিলনে গান গাহিতে কোনও দিন তেমন কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ বোধ করে নাই। আজ সে শচীন্দ্রের সম্মুখে গাহিবে। যদি গলাটা ধরিয়া যায়,—গান তেমন ভাল না হয়! তাহা হইলে কি হইবে?

কিন্তু তাহাকে গাহিতেই হইল। সংসারে শঙ্কাকুল হৃদয়ে এবং সঙ্কুচিত ভাবে এমন অনেক কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, যাহার পরিসমাপ্তি তৃপ্তি ও আনন্দ উভয়ই প্রদান করিতে পারে।

কল্যাণী গাহিতেছিল। বিন্দু বিন্দু স্বেদবারি তাহার ললাটে ও কপোলে সঞ্চিত হইয়াছে, উপরের পাথার বাতাসে তাহার চূর্ণ-কুন্তলগুলি একটু একটু উড়িতেছে। তাহার নীল সাড়ীখানির প্রান্তভাগ তাহার মাথার উপর দিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনাকারে দোদুল্যমান

বেণীটি বেষ্টিত করিয়া নামিয়া আসিয়াছে; চাঁপার কলির মত তাহার সুন্দর অঙ্গুলিগুলি হার্ম্মোনিয়মের চাবির উপর দিয়া নিপুণ ভাবে ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে; আর, সর্ব্বোপরি তাহার স্বপ্নময় কণ্ঠস্বরটুকু পুলকোচ্ছ্বসিত হইয়া সেই কক্ষের মধ্যে উত্থিত হইতেছে।

শচীন্দ্রনাথ একবার মুগ্ধনেত্রে এই সঙ্গীতরতা মহীয়সী নারী-মূর্ত্তির দিকে চাহিল;—প্রফুল্ল পঙ্কজের মত তাহার সুগৌর মুখখানি সঙ্গীত-ক্লান্তিতে আরও সুন্দর দেখাইতেছিল।

কল্যাণী একবার চক্ষু তুলিয়া চাহিল। শচীন্দ্রের চক্ষুর সঙ্গে তাহার আয়ত চক্ষু মিলিল। উভয়েই চক্ষু ফিরাইয়া লইল।

গান যখন শেষ হইয়া গেল, রাখাল বাবু তখন ধীরে ধীরে কহিলেন, "মা তোমার গান আজ বড় সুন্দর লাগিল।"

শচীন্দ্র ভাবিল, বড় সুন্দর লাগিয়াছে। কল্যাণীও বুঝিয়াছিল, বড় সুন্দর হইয়াছে। কল্যাণীর কেন যেন বারংবারই মনে হইতে-ছিল, কতদিন গান গাহিয়াছি, এমন তৃপ্তি ত আর কোন দিনই পাই নাই!

গানের মধ্য দিয়াই বুঝি হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয়টি পাওয়া যায়। এই বিদুষী কল্যাণীকে এতদিন পর্য্যন্ত শচীন্দ্রনাথ একটি নির্দ্দিষ্ট শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই দেখিয়া আসিয়াছে। আজ এই গানের পর তাহার মনে হইতেছিল, এতদিন পর্য্যন্ত যে একটি ছদ্ম কঠিন আবরণ এই রমণীর নারী-মহিমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। আজই সর্ব্বপ্রথম সে যেন কল্যাণীর নির্ম্মল

রমণীরূপ দেখিতে পাইল! পুরুষোচিত যে গরিমা ও স্বাতন্ত্র্য তাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল এবং কল্যাণীর যে স্বাতন্ত্র্যটুকুর সহিত শচীন্দ্রনাথ এ পর্য্যন্ত আপনার "বনিবনাও" করিয়া লইতে পারে নাই, তাহা এই গানের পর যেন দূরে চলিয়া গিয়াছে।

শচীন্দ্র দেখিল, এ নারী,—কোমলা স্নেহপূর্ণহৃদয়া নারী। লতিকা যতই দৃঢ় হউক, আশ্রয় পাইলে সে তাহার আশ্রয়-স্থানকে বেষ্টিত করিয়া ধরিবেই। পুরুষোচিত গুণের নিম্নে নারীত্বকে অক্ষুণ্ণ, অব্যাহত দেখিয়া শচীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হইল। কোনও অভিনন্দন-বাণী শচীন্দ্রনাথের মুখ হইতে নির্গত হইল না। তবু কল্যাণী বুঝিল, গান শচীন্দ্রকে তৃপ্ত করিয়াছে,—সে তাহার সঙ্গীত-শিক্ষাকে আজ সম্পূর্ণ সার্থক বলিয়া মনে করিল।

ধীরে ধীরে শচীন্দ্র কহিল, "অনেক রাত্রি হইয়াছে, এখন উঠিব।"

রাখাল বাবুকে নমস্কার করিয়া এবং কল্যাণীর দিকে একবার অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া শচীন্দ্র রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

৫

নদীর জলের মধ্য দিয়া বাষ্পীয় পোত অতিবাহন করিয়া চলিয়া যাইবার পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তরঙ্গের একটি উচ্ছ্বাস দুই কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া থাকে। গান শেষ হইয়া গেল, কিন্তু গানের একটা রেশ শচীন্দ্রের অন্তরে রহিয়া গেল! কে যেন মর্ম্মবীণার তন্ত্রীটি বড় জোর করিয়া টানিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে; সেই তন্ত্রীনির্গত

সুরটুকুর সহিত ঐ গানের সুরের মধুর রেশটুকু তাহার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া সমানভাবে বাজিয়া উঠিতেছিল।

ভোরের সূর্য্য যখন তাহার প্রথম কোমলরশ্মিপাতে শিশিরসিক্ত পুষ্পগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল, তখন শচীন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গের পর বুকের মধ্যে সে কেমন একটা অকারণ পুলকাবেগ অনুভব করিতেছিল। এই অনুভূতি তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল এবং তাহার নয়নে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিল। আজিকার আকাশে, বাতাসে যে আনন্দ, যে মাধুর্য্য উছলিয়া উঠিয়াছে, তাহার বুকের মধ্যেও যেন সেই আনন্দ ও মাধুর্য্যের তরঙ্গ আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

পিয়ন আসিয়া চিঠি দিয়া গেল। সেই চির-পরিচিত ধূসরচ্ছদাবৃত লিপিখানি।

শচীন্দ্র চিঠি খুলিয়া পড়িল। সেই চিঠির ভাষা, ভঙ্গী ও ভাবছন্দের ভিতর কল্পনাতীত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিতা একখানি মানসী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে শচীন্দ্রের নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল।

গত রজনী হইতেই শচীন্দ্রের অন্তরমধ্যে একটা সংগ্রাম বাধিয়াছিল। যে নারী অদৃশ্যা থাকিয়াও ধীরে ধীরে তাহার অন্তরমধ্যে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিল, তাহাকে হৃদয় হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া আজ আর শচীন্দ্রের পক্ষে সম্ভব নহে। যাহার বেদিকা, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, ধীরে ধীরে হৃদয়ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহাকে দূর করা সহজ নহে! সেই বেদিকা নিঃশেষ করিয়া তুলিয়া ফেলিতে চাহিলে,

তাহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ক্ষেত্রও যে অক্ষত রহিবে না, ইহা শচীন্দ্র অতি নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু কোথায় সে? মাসান্তে তাহার একখানি রহস্যাবৃত লিপি আইসে;—এই ত মাত্র সম্বল। এই সম্বলটুকু লইয়া সে জীবনপথে কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে? আর, সেই লিপির মধ্যে এক ভক্ত-হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন ছাড়া সে কি আর কিছুর নিদর্শন পাইয়াছে? শুধু সামান্য কয়খানি চিঠি;—তাহার পশ্চাতে কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই! নিবিড় কল্পনার অন্ধতম আবরণে আবৃতা এক নারীর ছায়া লইয়া সে কেমন করিয়া বাচিবে? কিন্তু এই লিপিপ্রেরিকা—যে তাহার মতকে শ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়া লইয়াছে, যে তাহার সাহিত্যসেবাকে অন্তরের উৎসাহবাণী ও প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিতে চাহিয়াছে, সে কি ধরা দিবে না? সে কি চিরদিনই এমনই করিয়া দূরে দূরে থাকিয়া যাইবে?

শচীন্দ্রনাথের অন্তর বলিতেছিল, তাহাকে আসিতেই হইবে, তাহাকে ধরা দিতেই হইবে। সেই দূর-ভবিষ্যতের অনির্দ্দিষ্ট দিনটির জন্য সে কি আপনার নিষ্ঠ প্রেমকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবেনা? যে নারী মাসের মধ্যে অন্ততঃ একটি দিনকেও তাহার নিকট অভিনন্দন-প্রেরণের জন্য একান্তভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতে পারিয়াছে, সে কি কোনও দিনই কল্পনালোক হইতে বাস্তবরাজ্যে তাহার নয়ন-সমক্ষে নামিয়া আসিবে না? না তাহাকে আসিতেই হইবে।

কিন্তু কল্যাণী? সঙ্গীত-শ্রমকাতরা সেই কিশোরীর প্রশান্ত নয়ন দুইটি ঐ যে তাহার স্বপ্নময় দৃষ্টিটুকু লইয়া, যেন তখনও তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সেই জলভরা চক্ষু দুইটির প্রশান্ত দৃষ্টি যেন জীবনের পরপার পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত!

কি করিবে শচীন্দ্রনাথ?

কল্পনার পুণ্যবেদিকাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া, সে কি তাহার মর্ম্মস্থলে ঐ কল্যাণীর জন্যই প্রেমসিংহাসন পাতিয়া রাখিবে?

৬

'কল্যাণী' পত্রিকায় 'বসুন্ধরার' 'দীপিকা'-সমালোচনার তীব্র আলোচনা বাহির হইয়াছে।

শচীন্দ্র যখন জানিল, কল্যাণী স্বয়ংই লেখিকা, তখন তাহার বুকের ভিতর সে কেমন একটা নূতনতর স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিল। আপনার জনের শরীরে আঘাত লাগিলে মানুষ যে ভাবে প্রতীকারপরায়ণ হইয়া উঠে, কল্যাণী ঠিক তেমনই ভাবে হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি দিয়া তাহার আক্রমণকে শাণিত ও তীব্র করিয়া তুলিয়াছিল।

সেদিনের সান্ধ্যসভায় তখন পর্য্যন্ত কেহ আইসে নাই। রাখাল বাবু তাঁহার আরাম-কেদারাটার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছেন। কল্যাণী পিতার আজ্ঞামত সেই আলোচনাটিই পাঠ করিতেছিল। কল্যাণীর কণ্ঠস্বরটা মধ্যে মধ্যে যেন ধরিয়া

আসিতেছিল। প্রবন্ধের মধ্যে যে কয় স্থানে শচীন্দ্রনাথের নাম ছিল, সেই স্থানগুলি ঠিক সহজভাবে সে পড়িয়া যাইতে পারিতেছিল না। তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বর যেন একটু কাঁপিয়া যাইতেছিল, কর্ণ-মূলটা একটু যেন বেশী উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, আর তাহার গোলাপী কপোলের কাছটা দিয়া শোণিতের একটা দ্রুত উচ্ছ্বাস মধ্যে মধ্যে আসিয়া পড়িয়া তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল!

হঠাৎ রাখাল বাবু ডাকিলেন, "মা!"

কল্যাণী পাঠ বন্ধ করিয়া উত্তর দিল, "বাবা!"

"একটা কথা বলিব মনে করিতেছি!"

"কি কথা, বাবা?"

"আজ যদি তোর মা থাকিতেন!"—রাখালবাবুর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। কল্যাণী বুঝিল, পিতা যে কথাটি বলিবেন, বহুক্ষণ হইতে তাহার বিষয়ে মনে মনে আলোচনা করিতেছেন।

কল্যাণীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। পিতা আজ এমন করিয়া কথা বলিতেছেন কেন? পিতার দিকে আর একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া কল্যাণী তাঁহার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরবে রহিলেন।

শোকের এই নীরবতাটুকু বড় পবিত্র—বড় মধুর।

গৃহের ও অন্তরের লক্ষ্মীস্বরূপিণী সেই সাধ্বী রমণী, একমাত্র কন্যাকে উপহার দিয়া আজ যোড়শ বর্ষ অতীত হইল চিররহস্যাবৃত লোকে চলিয়া গিয়াছেন, তবু তাঁহার স্মৃতিটুকু রাখাল বাবুর হৃদয়ে

নিশি-দিন সমানভাবে জাগিয়া আছে। আজ এই মেঘমেদুর বর্ষার সন্ধ্যায় যখন বাহিরে সমস্ত প্রকৃতি কাহার জন্য উন্মুখ অপেক্ষায় জাগিয়া রহিয়াছে, তখনও রাখাল বাবুর প্রৌঢ়হৃদয়-মধ্যে পরলোকবাসিনী পত্নীর প্রীতি নিঃশব্দে ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল।

পার্শ্বে কন্যা কল্যাণী ;—তাহার মূর্ত্তিতে সেই প্রিয়মূর্ত্তির প্রতিচ্ছায়া দিনে দিনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। সেই অঙ্গসৌষ্ঠব, সেই মুখাবয়ব, সেই জলভরা বিষাদচ্ছায়াচ্ছন্ন চক্ষু দুইটি !

রাখাল বাবু ধীরে ধীরে কহিলেন, "মা, কাল নীপেশের বন্ধু ক্ষিতীশ আসিয়াছিল। নীপেশ বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।"—রাখাল বাবু কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন ; কল্যাণীর মুখে বিষাদের ছায়া গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। তিনি কল্যাণীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহার ললাটে ও মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

নীপেশের সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহ আর যে সম্ভব নহে, এই ধারণাটা কেন যেন তাঁহার মনে ক্রমেই বদ্ধমূল হইতেছিল। এ ব্যাপারের একটা মীমাংসা সত্বর করিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। নীপেশ যে যখন তখন লোক পাঠাইয়া তাড়া দেয়, ইহাতেও রাখাল বাবু তাঁহার অন্তরের মধ্যে একটা অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছিলেন। সুতরাং আজই কল্যাণীর মত গ্রহণ করিয়া, নীপেশকে কালই কিংবা দরকার হইলে আজ রাত্রিতেই ডাকাইয়া আনিয়া একটা শেষ উত্তর দিয়া দিবেন,

এই সংকল্প তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন।

নীপেশ বহুগুণসম্পন্ন। শচীন্দ্রনাথ আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাখাল বাবু নীপেশকেই ভাবী জামাতা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শচীন্দ্র আসিবার পর হইতে নীপেশের মধ্যে যে একটা অকারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষের ভাব দেখা যাইতেছিল, তাহাই নীপেশকে রাখাল বাবুর নিকট অনেকটা ছোট করিয়া দিয়াছিল। 'দীপিকা'-সমালোচনার ব্যাপার লইয়া কল্যাণীকে যখন প্রকাশ্যভাবেই একটু উগ্র ও প্রতীকারপরায়ণ দেখা গেল, তখনই রাখাল বাবু নীপেশের সম্বন্ধে কতকটা হতাশ হইয়া পড়িলেন। কল্যাণীর তীব্র আলোচনা যখন ছত্রে ছত্রে হলাহল উদ্গীর্ণ করিল, তখন রাখাল বাবু আর অপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করিলেন না। যত শীঘ্র হউক্ একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া ফেলিবার জন্য তিনি আজিকার সন্ধ্যাকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন।

কল্যাণীর মনোগত ভাব বুঝিতে আর বাকী রহিল না, তখন তিনি এ বিষয়ে তাহাকে আর প্রশ্ন করা সমীচীন মনে করিলেন না।

এমন সময়ে কক্ষমধ্যে শচীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিল। কল্যাণী পিতার কাছ হইতে একটু সরিয়া একটা টেবিলের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

রাখাল বাবুকে নমস্কার করিয়া শচীন্দ্র একবার কল্যাণীর দিকে

চাহিল। কল্যাণীর চক্ষু শচীন্দ্রের প্রতিভাদীপ্ত মুখখানির উপরেই নিবদ্ধ ছিল; শচীন্দ্র চাহিতেই তাহাদের চক্ষু মিলিত হইল। শচীন্দ্র দেখিল, সেই প্রশান্ত নির্ম্মল চক্ষু দুইটির প্রান্তে বিষাদ-কালিমা-রেখা পড়িয়াছে; কাঞ্চন-গৌর বর্ণচ্ছটা মলিন হইয়াছে, চারুদেহলতা যেন সূর্য্যতাপক্লিষ্ট মল্লিকা কুসুমের ন্যায় শুকাইয়া উঠিয়াছে।

রাখাল বাবু কহিলেন, "'কল্যাণীতে' যে আলোচনা বাহির হইয়াছে, দেখিয়াছ শচীন্?"

শচীন্দ্র একটু অন্যমনস্ক ছিল, চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "আজ্ঞা হাঁ দেখিয়াছি।"

শচীন্দ্র জানিয়াছিল, লিখাটা কল্যাণীর; তবু জিজ্ঞাসা করিল, "কে লিখিয়াছেন নাম দেওয়া নাই ত।"

রাখাল বাবু কল্যাণীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "এইবার ত আর চাপা যায় না, মা!"

"উনিই লিখিয়াছেন?"—শচীন্দ্রনাথের প্রীতিপ্রফুল্লদৃষ্টি বুঝি কল্যাণীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারে পুরস্কৃত করিল!

কল্যাণী একবার তাহার ভূতলবদ্ধ দৃষ্টি ঈষৎ তুলিয়া অপাঙ্গে শচীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল।

শচীন্দ্র দেখিল, সেই পুলকিত দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময়ে নীপেশ কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। নীপেশ প্রবেশ করিবার সময়েই কল্যাণীর সেই অপাঙ্গদৃষ্টিটুকু লক্ষ্য করিয়াছিল। যে দৃষ্টি শুধু তাহার দিকেই প্রেরিত হইবে বলিয়া

সে এতকাল আশা করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহা ভিন্নপাত্রে বিন্যস্ত দেখিয়া নীপেশের মর্ম্মস্থল বেদনায় আর্ত্ত হইয়া উঠিল। কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সে একখানি ছোট টুলের উপর আহতের মত বসিয়া পড়িল। রাখাল বাবু চাহিয়া দেখিলেন, তাহার মুখ একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার দৃষ্টিতে এমন একটা কাতরতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা দেখিলেই মনে হয়, সে এখনই হয় ত তাহার আসন হইতে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া যাইবে।

"অসুখ করিয়াছে কি, নীপেশ?"—সস্নেহ কণ্ঠে রাখাল বাবু নীপেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

নীপেশ একবার কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিল। এক জন সাধারণ পীড়িতের জন্য যতটুকু উদ্বেগের লক্ষণ এক জন করুণহৃদয়া রমণীর মুখে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে, তার বেশী একটা সহানুভূতির রেখাও কি নীপেশ সে মুখে দেখিবার আশা করিতে পারে না?

না।—সে মুখে তাহার জন্য উদ্বেগ আছে;—কিন্তু সহানুভূতির চিহ্ন এতটুকুও নাই!

নীপেশ বাণাহতের মত আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"না—না অসুখ করে নাই।"—তাহার পরেই সে পাগলের মত অস্থির-পদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

৭

সে দিন সকালবেলা কল্যাণী একটি অপ্রত্যাশিত দ্রব্য লাভ করিল। পিতার দেরাজ টানিতেই সে দেখিল, তাহার মধ্যে একখানি ছোট ফটো। ফটোখানি শচীন্দ্রনাথের; 'কল্যাণী'তে ছবি দিবার জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। কল্যাণী দেরাজ টানিয়াই ছবিখানি দেখিল। তাহার বুকের মধ্যে একটা রক্তের ঝলক বড় জোরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, পদের নিম্ন হইতে হর্ম্ম্যতল যেন সরিয়া যাইতেছিল।

কল্যাণী চকিতের মত একবার এদিকে ওদিকে চাহিল,—ছবিখানি দেখিতে হইবে। সে ত শচীন্দ্রনাথের মুখের দিকে কোনও দিনই তেমন ভাল করিয়া চাহিতে পারে নাই। আজ এই ছবি-খানিকে সে একেবারে নিজস্ব করিয়া লইবার সুবিধা পাইয়াছে; সে এমন সুযোগ কিছুতেই ছাড়িতে পারে না।

কল্যাণী কম্পিত হস্তে ছবি বাহির করিয়া লইল। সেই দিনই ভাল ফটোগ্রাফারের দোকানে ছবি পাঠাইয়া দিয়া কাপি তুলিয়া লইবে এবং মূল ছবিখানি যথাস্থানে রাখিয়া যাইবে, এমনই একটা কল্পনা সে মুহূর্ত্তের চিন্তায় স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল।

নীলাম্বরীর অঞ্চলতলে ছবিখানি ঢাকিয়া লইয়া কল্যাণী কম্পিত পদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া একেবারে তাহার নিজের পাঠাগারে প্রবেশ করিল। চেয়ারের উপর বসিয়া কল্যাণী অঞ্চলাবরণ হইতে ছবি বাহির করিল;—সেই বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, প্রতিভায় দীপ্ত, শান্ত, সরল মুখখানি! দৃষ্টিতে তাহার প্রীতি

উছলিয়া পড়িতেছে ; প্রশান্ত ললাটে গরিমালেখা অভ্রান্তভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে।

কল্যাণী চাহিয়া চাহিয়া দেখিল ; সে ছবি দেখিয়া আশা আর মিটে না। সে তাহার অন্তরের প্রেমরাশিকে যাহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া দিয়াছিল, সেই নিষ্ঠুর দেবতা ত এক দিনের জন্যও তাহার দিকে ফিরিয়া চাহে নাই। তাহার নিবেদিত নৈবেদ্য অস্পৃষ্ট, অগৃহীত, অস্বীকৃত হইয়াই পড়িয়া রহিয়াছে !

কল্যাণীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। হায় দেবতা, হায় নিষ্ঠুর ! কবে তুমি ভক্তের মৌন নিবেদনকে স্বীকার করিয়া তাহাকে সার্থকতা প্রদান করিবে ? অসহায়া নারীর ব্যথিত মর্ম্মবিতানের অন্তরালে যে মন্ত্র নিশিদিন ধ্বনিত হইতেছে,—কবে সেই মন্ত্র প্রেমকে প্রতিষ্ঠা প্রদান করিবে ? কবে তাহার প্রসন্ন দেবতা তাহার পূজা গ্রহণ করিবার জন্য পার্থিব স্বর্গের দ্বারে নামিয়া আসিবেন ?

আজ এই ব্যথিতা নারীর অন্তর মথিত করিয়া কি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে, হে দেবতা, ওগো নিষ্ঠুর, তুমি ত তাহা জানিতেও পারিলে না !

কল্যাণীর তৃষিত নারীপ্রকৃতি আজ অবসর বুঝিয়া তাহাকে একেবারে অভিভূত করিল।

অন্তর-দেবতার সেই মোহন প্রতিকৃতিখানি একবার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আজ তাহাকে একেবারে পাইয়া বসিল। কিন্তু কল্যাণী ত সে অধিকার পায়

নাই! সেই একটিমাত্র প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে দমিত করিয়া ফিরাইয়া দিবার জন্য যতটুকু শক্তির প্রয়োজন, কল্যাণী তাহা তাহার দীর্ণ হৃদয়ের উপর প্রযুক্ত করিল। তাহার ব্যথিত অন্তর আরও কাতর হইয়া উঠিল। কিন্তু তবু নারী-হৃদয় একটা সম্বল চাহে; সুখের বা দুঃখের এমন একটা স্মৃতি নারী চাহে, যাহা লইয়া সে জীবনের সুদীর্ঘ পথটি অতিবাহিত করিয়া যাইতে পারে। যাহাকে বুকের কাছে পাইবার অধিকার পাওয়া যায় নাই, মাথা নামাইয়া তাহার চরণস্পর্শ সুখটুকুও পাওয়া যায় না কি?

কল্যাণীর অবসন্ন হাত দুইখানি টেবেলের উপর পড়িয়া গেল, —সে তখন প্রতিকৃতিখানির চরণের কাছে তাহার মাথা নীচু করিয়া আনিল: তখন তাহার অশ্রুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অন্তরের মধ্যে একটা বেদনাপূর্ণ বিরাট অবসন্নতা জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল।

"হে দেবতা, তোমাকে বুকের কাছে পাইবার অধিকার ত পাই নাই, তোমার চরণ স্পর্শ করিব, অপরাধ লইও না!"— কল্যাণীর অন্তরের মধ্যে যে কথা নীরবে গুমরিয়া উঠিতেছিল, তাহারই অস্ফুট গুঞ্জন আজ নিঃশ্বাসে, বেদনায়, অশ্রুতে জড়িত হইয়া বাহির হইয়া আসিল।

কল্যাণী ধীরে ধীরে সেই ছবিখানির চরণে তাহার ওষ্ঠস্পর্শ করিল।

মুখ তুলিতেই সম্মুখের দর্পণে তাহার দৃষ্টি পড়িল। সেই

সুবৃহৎ দর্পণে এক জীবন্ত মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে; কল্যাণী চিনিল—সে প্রতিবিম্ব শচীন্দ্রনাথের।

শচীন্দ্রনাথ অশ্রুমুখী কল্যাণীকে দেখিল। স্রস্তকুন্তলদাম শৈবালরাজির মত তাহার প্রস্ফুটিত পঙ্কজতুল্য চারু মুখখানির উপর আসিয়া পড়িয়াছে; অশ্রুভারাবনত চক্ষু দুইটি ঈষৎ স্ফীত হইয়াছে!

কল্যাণী দেখিল, তাহার অন্তরদেবতা, তাহার প্রণতি গ্রহণ করিবার জন্যই যেন এমন সময়ে, এমন করিয়া কাছে আসিয়াছেন! তাহার মনে হইল, অতীতের কোন্ যুগে তপঃকৃশা গৌরীর মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে দেবাদিদেব শশাঙ্কশেখর বুঝি এমনই করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিষ্ঠাপূর্ণ তপস্যাকে সার্থকতা প্রদান করিয়াছিলেন।

তাহার দেবতা কি তাহাকে সার্থকতা দিবেন না?

কল্যাণী তাহার বুকের মধ্যে বড় বেশী অস্থিরতা অনুভব করিতেছিল। সে ধরা দিতে চাহে নাই, তবু আজ সে ধরা পড়িয়াছে। সেই নির্জ্জন কক্ষের মধ্যে সে যখন তাহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিতেছিল, তখনই সেই অন্তরতম প্রদেশের প্রভু নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার কাছে আসিয়া পড়িয়া তাহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছেন।

আজ মুগ্ধ-হৃদয়া নারীর দুর্ব্বলতা ধরা পড়িয়াছে;—সে তাহার দীর্ণ হৃদয়কে আর কোন মতেই শান্ত, স্থির রাখিতে পারিল না।

কল্যাণী সম্মুখের টেবলের উপর আবার অবসন্নভাবে নত হইয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল;—তাহার স্রস্তকুন্তলরাশি

তাহার মুখখানিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আজ তাহার হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—সে যে নারী, সে যে নিতান্ত অসহায়া, তাহা বিশ্ববিজয়ী প্রেম আজ তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে!

কল্যাণীর পাঠাগারে শচীন্দ্রনাথের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু সে ত এমন করিয়া মুগ্ধা নারীর হৃদয়ের গোপন ব্যথাটী জানিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না! যে প্রেম তাহাকেই অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে এমন করিয়া হঠাৎ আসিয়া পড়িয়া তাহা জানিবার কি অধিকার তাহার আছে?

শচীন্দ্র ধীরে ধীরে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া একেবারে বাসায় চলিয়া আসিল।

৮

বুকের মধ্যে এক বিশ্ববিদাহী জ্বালা লইয়া শচীন্দ্রনাথ যখন বাসায় ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার বাহ্য সংজ্ঞা একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে। শয্যার উপর সে নিতান্ত অবলম্বনবিহীনের ন্যায় শুইয়া পড়িল। তাহার বুকের মধ্যে বড় ফাঁকা বোধ হইতেছিল। একটা কিছু আঁকড়াইয়া বুকের সঙ্গে চাপিয়া না ধরিয়া সে আর কোন-মতেই স্থির হইতে পারিল না; একটা বালিশ টানিয়া লইয়া সে আকুলভাবে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল।

শচীন্দ্রনাথের মনে পড়িল, কবে পল্লী-উদ্যানে সে এক দিন দেখিয়াছিল, এক পল্লবিনী লতিকা সহকারকে বেষ্টিত করিতে চাহিতেছে;—কিন্তু পারিতেছে না! তখন সে স্নেহে, আদরে

প্রতিকার উন্মুখ আগ্রহকে সার্থক করিয়া দিয়াছিল। আর আজ এক কুসুমাধিক পেলবা নারী, তাহারই উদ্দেশ্যে হৃদয়ের সমগ্র প্রেমরাশি নীরবে নিবেদন করিয়া দিতেছে, সে তবুও তাহা স্বীকার করিবার জন্যও আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না। কোথায় তাহার বাধা, কেমন করিয়া সে তাহা বুঝাইবে?

হায়, নিষ্ঠুর অদৃষ্টের মত কোথায় তুমি শচীন্দ্রনাথের মানসী প্রতিমা? মাসান্তে লিপির মধ্যে দিয়া তোমাকে একটিবার কল্পনায় অনুভব করিয়া অভিশপ্ত শচীন্দ্রনাথ কেমন করিয়া বাঁচিবে? ও গো মানসী, ওগো কল্পনা স্বর্গবাসিনী, তুমি এস, তুমি এস! তোমার বিদ্যুদ্‌বর্ষী কটাক্ষপাতে শচীন্দ্রনাথের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া দিয়া যাও।

৯

নীপেশের সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহ-প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ার পর কিছু দিন পর্য্যন্ত রাখাল বাবু নিশ্চিন্ত রহিলেন। কল্যাণীর হৃদয়ে শচীন্দ্রনাথের জন্য অনুরাগ-বহ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে, রাখালবাবু তাহা বুঝিয়াছিলেন। ইহারা পরস্পরের প্রতি আর একটু বেশী আকৃষ্ট হইলেই তিনি শচীন্দ্রনাথের নিকট বিবাহ প্রস্তাব করিবেন, মনে মনে এই কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু নারীহৃদয়ে প্রেম কখন্ প্রথম প্রবেশলাভ করে এবং কখন্ সেই প্রেম পূর্ণ-পরিণত হইয়া উছলিয়া পড়িতে আরম্ভ করে, পুরুষ তাহা কোনও দিনই স্থির করিতে পারে না। কল্যাণীর উচ্ছ্বসিত

প্রেমাবেগ শচীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করিয়া গেল; কিন্তু তাহার হৃদয়ে যে একটিও তরঙ্গ উঠিয়াছে, এমন কোনও লক্ষণই কল্যাণী শচীন্দ্র-নাথের ব্যবহারে দেখিতে পাইল না!

শচীন্দ্রনাথ যে দিন আপনার বিধ্বস্ত হৃদয়কে শান্ত করিবার জন্য কলিকাতা ছাড়িয়া পশ্চিমে চলিয়া গেল, কল্যাণী সেই দিনই শয্যাগ্রহণ করিল। তাহার উচ্ছ্বসিত প্রেমকে এমন করিয়া উপেক্ষা করিয়া, অস্বীকার করিয়া, শচীন্দ্রনাথ চলিয়া গেল, এ ব্যথা অভিমানিনী কল্যাণী কোনও মতেই ভুলিতে পারিল না। তাহার বুকখানা লইয়াই যত জ্বালা, যত গোল! এক মুহূর্ত্তের জন্যও আর সে বুকের মধ্যে স্বচ্ছন্দতা, আরাম অনুভব করে না! সমগ্র বুকখানাই যেন খালি হইয়া গিয়াছে, সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য তাহার যে কিছুই নাই,—এতটুকু স্মৃতিও নাই! সে আর কোন্ সান্ত্বনা লইয়া, কোন্ কল্পনা লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে?

কল্যাণী ভাবিল, নিষ্ঠুর শচীন্দ্রনাথ যখন কোন পথই দেখাইয়া দিয়া যায় নাই, তখন যে পথ খোলা আছে সেই পথই সে গ্রহণ করিবে। তাহার বুকের মধ্যে যে দহন আরব্ধ হইয়াছে, মৃত্যুর তুষারশীতল স্পর্শই শুধু সেই দহনকে নির্ব্বাপিত করিয়া দিতে পারে।

কল্যাণী স্থির করিল—"মরিব"। তাহার বুকের মধ্যে একটা করুণ-বেদনাপূর্ণ সুর গুমরিয়া উঠিতেছিল; সে সুর ফিরিয়া ফিরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতেছিল, "কল্যাণী মরিবে, কল্যাণী মরিবে।" কল্যাণী সে সুরকে অশ্রু দিয়া, বুকের রক্ত দিয়া চর্চ্চিত করিয়া দিতেছিল।

শচীন্দ্রনাথের ছবিখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া কল্যাণীর বড় সাধ হইতেছিল, একবার সেখানি বুকের কাছে চাপিয়া ধরে। বুকটা বড় খালি হইয়া গিয়াছে সেই প্রিয় ছবিখানি চাপিয়া ধরিলে বুঝি শূন্য স্থান কতকটা পূর্ণ হইবে!

তাহার বক্ষপঞ্জর নিষ্পিষ্ট করিয়া দিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিতেছিল, কল্যাণী কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"না নিষ্ঠুর, তোমার দেওয়া কোনও অধিকারই ত পাই নাই, সব সাধ আমার দীর্ণ বক্ষের মধ্যেই লুণ্ঠিত হউক! আমি মরিব,—আমার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়াও কি তুমি আমাকে কোনও অধিকারই দিবে না?"

তখন কল্যাণী সেই কক্ষের মধ্যে পড়িয়া ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

১০

শচীন্দ্র কলিকাতা ছাড়িয়া কয়েক দিন পশ্চিমের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইল; তাহার পর বারাণসীধামে ছোট একটা বাসা ভাড়া করিয়া তথায় কিছু দিনের জন্য রহিয়া গেল।

বারাণসীতে বাসা করার একটা প্রলোভন ছিল। যে লিপি তাহার জীবনেতিহাসের এক পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া রহিয়াছে, একটি নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় না থাকিলে সেই লিপি তাহার নিকট নিয়মিত নাও আসিতে পারে। শচীন্দ্রের বিশ্বাস ছিল, সে বারাণসীতে থাকিলে, তাহার ঠিকানা সেই নারীর কাছে অজ্ঞাত রহিবে না।

বাসা ঠিক করিয়া শচীন্দ্রনাথ কর্ত্তব্যবোধে রাখাল বাবুর কাছে

এক পত্র লিখিল। শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা বশতঃই সে যে তাঁহাকে সংবাদ না দিয়া হঠাৎ কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে এ জন্য সে রাখাল বাবুর কাছে ত্রুটি-স্বীকারও করিল।

বারাণসীতে আসিয়াও শচীন্দ্রের মন সুস্থির হইল না। তাহার অন্তরে ও বাহিরে যে এক প্রবল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই ঘাত-প্রতিঘাত তাহাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল। অন্তরে এক নারীর ছায়ামূর্ত্তি। কল্পনার লাস্যলীলায় সে তাহাকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছে; আর অন্তরের বাহিরে লীলাময়ী কল্যাণীর বাস্তব প্রতিমা;—সে তাহার বাহুবল্লরী দিয়া তাহাকেই বেষ্টিত করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এক ব্যথিত নারী এমন করিয়া তাহার প্রেমকে তাহার কাছে নিবেদন করিয়া গিয়াছে,—সে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া পৃথিবীর কোন্ নিভৃত কোণে যাইয়া লুকাইবে! না,—সেই অশ্রুপ্লাবিত নয়নের ধ্রুব দৃষ্টিটুকু যে তাহাকে জীবনের পরপার পর্য্যন্তও অনুসরণ করিতে চাহিতেছে।

প্রতি সন্ধ্যায় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতি দেখিতে দেখিতে শচীন্দ্র মনে ভাবিত, হায়, যদি তাহার ব্যর্থ জীবনারতির মাঝখানে সে তাহার অস্তিত্বটুকুকে একেবারেই নিঃশেষ করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া দিতে পারিত! এই যে একটা বিরাট অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়া সে তাহার দুর্ব্বহ জীবনটাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, কোথায় ইহার সার্থকতা? আরতির শেষে সে যখন দেবতার সম্মুখে লুটাইয়া পড়িত, তখন তাহার বেদনা-কাতর হৃদয় হইতে

শুধু এই প্রার্থনাই বাহির হইয়া আসিত, হে বিশ্বের ঠাকুর, হে দয়াল, এমন একটু কিছু দাও, যাহার স্মৃতি লইয়াও জীবনটাকে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারি!

কয়দিন কাটিয়া গেল। এ মাসের লিপিখানি শচীন্দ্রনাথ এখনও পায় নাই। যে সূক্ষ্ম তন্তুটুকুর সহিত সে তাহার জীবনটাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, হায় রে, বুঝি তাহাও ছিন্ন হইয়া যায়! মাসের শেষ দিনটাও আসিল, চলিয়া গেল; কিন্তু সেই ধূসরচ্ছদাবৃত লিপিখানি আর আসিল না।

পরদিন যখন শয্যাত্যাগ করিয়া শচীন্দ্রনাথ বাহিরে আসিল, তখনও ভোরের আলো ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। দূরে বড় বড় পাথরের বাড়ীগুলার আশেপাশে তখনও একটু একটু অন্ধকার জমিয়া রহিয়াছে। শচীন্দ্র তাহার জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বহুদূর হইতে নহবতের করুণ রাগিণী ভাসিয়া আসিতে-ছিল। জাহ্নবীস্নানার্থীরা যাইতেছে, আসিতেছে। ধীরে ধীরে কর্ম্মকোলাহল জাগিয়া উঠিতেছে। বিশ্বের এই কর্ম্মতরঙ্গের মধ্যে একটা ঐক্য, একটা শৃঙ্খলা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। এই ঐক্য ও শৃঙ্খলার মধ্যে শুধু সে-ই যেন কেমন করিয়া অনাবশ্যকরূপে, অশোভন ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। সে যদি এই কর্ম্মস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে না চলিতেই পারে, তবে কেন সে তটভূমিতে এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে।

এমন সময়ে ঘরের কাছে আসিয়া দ্বার ঠেলিয়া কে সস্নেহকণ্ঠে ডাকিল "শচীন্"—

চমকিত শচীন্দ্র মুখ ফিরাইয়া দেখিল, রাখাল বাবু।

"আপনি! কবে এখানে আসিলেন?" বিস্মিত শচীন্দ্রনাথ দেখিল, রাখাল বাবুর সদাহাস্যপ্রফুল্ল মুখ গাঢ় বিষাদচ্ছায়াপাতে মলিন হইয়া উঠিয়াছে!

"আমি কাল সন্ধ্যায় আসিয়াছি,—কাল আর তোমার কাছে আসিতে পারি নাই, আজ ভোরেই আসিয়াছি! আমাদের বাসায় একবার যাইবে শচীন্?"—তিনি শেষের কয়টি কথা বলিবার সময়ে শচীন্দ্র দেখিল, রাখাল বাবুর কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিল;—চক্ষুতে অশ্রুর একটা ক্ষণিক উচ্ছ্বাস দেখা গেল!

শচীন্দ্র আর সাহস করিয়া কল্যাণীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। যন্ত্রচালিতের মত বলিল, "চলুন্, যাইব।"—উভয়ে নীরবে পথ অতিবাহিত করিলেন। বাসায় প্রবেশ করিয়া রাখাল বাবু কহিলেন, "শচীন্, কল্যাণী পীড়িতা; একবার দেখিবে কি?"

শচীন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছিল। কল্যাণীর পীড়ার কথা শুনিয়া তাহার অন্তরে কোন্ অশরীরী বাণী যেন তাহাকে কেবলই ডাকিয়া বলিতেছিল, এই রুদ্ধদ্বার কক্ষের মধ্যে যে নারী তোমারই অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে, সেই তোমার রাণী; তোমারই মানসী;—তোমারই কল্যাণী!

শচীন্দ্রের কেবলই মনে হইতে লাগিল, কল্পনা ও বাস্তব যেন আজই এক মিলনসূত্রে গ্রথিত হইয়া যাইবে। আজ যেন এমনই একটা মুহূর্ত্ত আসিয়া পড়িয়াছে, যে মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় সে এতদিন

কাটাইয়াছে ;—আজ অন্তর ও বাহির তাহার কাছে একই মূর্ত্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িবে !

এ এক অননুভূতপূর্ব্ব নূতন চিন্তা কেন যে তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল, সে তাহা কোনও মতেই স্থির করিতে পারিল না। রাখাল বাবুর কথার উত্তর না দিয়া সে দুয়ার ঠেলিয়া কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল, স্প্রীং-এর কবাট আবার রুদ্ধ হইয়া গেল !

শচীন্দ্র কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, জানালার পাশে ছোট একখানি সোফার উপর কল্যাণী শয়ন করিয়া রহিয়াছে। সে শূন্য দৃষ্টিতে জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরের আকাশ দেখিতেছিল।

শচীন্দ্রের পদশব্দ শুনিয়া কল্যাণী ফিরিয়া চাহিল ; মুহূর্ত্তমাত্র ! একটা অস্পষ্ট কাতরতাব্যঞ্জক মৃদুধ্বনি কল্যাণীর মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল।

শচীন্দ্র দেখিল, রুক্ষ কুন্তলরাজি সেই পাণ্ডুর মুখখানির উপর আসিয়া পড়িয়াছে ; সেই ইন্দীবরতুল্য নয়ন দুইটির কোণে কে বিষাদকালিমারেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। সেই লীলাতরঙ্গায়িত দেহলতা ক্ষীণ হইয়াছে ! সেই চারুপ্রতিমা তপঃকৃশা গৌরীর ন্যায় প্রতীয়মানা হইতেছে।

কল্যাণী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গ বড় কাঁপিতেছিল ; দিনের আলো যেন নিবিয়া গিয়াছে। চক্ষের সম্মুখে এমনই একটা কালো ছায়া নাচিয়া উঠিল !

কল্যাণী এক হাতে বক্ষোবসন চাপিয়া রাখিয়া, আর এক হাতে

খাটের একটা বাজু ধরিল, তবু স্থির হইতে না পারিয়া দুই হাতে বাজুটা চাপিয়া ধরিল। তখন কল্যাণীর বক্ষোবসনের নিম্নে কি লুকান ছিল, তাহা সরিয়া শয্যার উপর পড়িল!

কি সে?—শচীন্দ্র দেখিল, একখানি ধূসরবর্ণের খাম! উপরে সেই চিরপরিচিত হস্তাক্ষরে তাহারই নাম লিখিত রহিয়াছে!

একটা তড়িৎপ্রবাহ বিপুলবেগে শচীন্দ্রনাথের মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিল,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল; তাহার হৃৎপিণ্ড নিষ্পিষ্ট করিয়া যাতনাপূর্ণ চীৎকারধ্বনি বাহির হইয়া আসিল,—"কল্যাণি—কল্যাণি—তুমি! রাক্ষসি, তুমি—এখানে—"

কল্যাণীর মূর্চ্ছার ভাবটা কাটিয়া আসিতেছিল, সে চাহিয়া দেখিল, তাহার সেই ধূসরচ্ছদাবৃত লিপিখানি শচীন্দ্রনাথের হস্তে রহিয়াছে!

কল্যাণী আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার বক্ষের গুরু স্পন্দন তাহাকে বড় অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। পুনরায় তাহার মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল; তাহার মূর্চ্ছাতুর নিস্পন্দ দেহলতা সেই শুভ্র শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল!

১১

কল্যাণীর পীড়া বাড়িয়া চলিয়াছে। মিলনের প্রথম কলোচ্ছ্বাসের মধ্যেই যে এমন করিয়া অন্তহীন বিরহ সূচিত হইবে, শচীন্দ্রনাথ তাহা কোনও কালেই মনে করে নাই। কোন্ এক দিন নৈরাশ্যের তীব্রতম দহনের মধ্যে সে দেবতার কাছে এতটুকু স্মৃতির চিহ্ন চাহিয়াছিল, যে স্মৃতিচিহ্ন লইয়া সে জীবনকে অবসান

করিয়া দিতে পারিবে মনে করিয়াছিল; আজ দেবতা তাহার প্রার্থনা ঠিক পরিমাণ করিয়া ততটুকুই পূরণ করিতে যাইতেছেন!

কিন্তু এমন করিয়া মৃত্যুপথযাত্রিণী কল্যাণীর মধ্যেই যে তাহার অমূর্ত্ত কামনারাশিকে মুহূর্ত্তের পরিচয়ান্তেই একেবারে নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিতে হইবে, ইহা শচীন্দ্রনাথ স্বপ্নেও কখনও মনে করিতে পারে নাই। তাহার জীবনের এই যে শুভমিলনমুহূর্ত্ত দেবতা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন,—এই মুহূর্ত্তটিকে সে কোন‑ক্রমেই অসার্থক হইতে দিতে পারে না।

এই মুহূর্ত্তটির মধ্য হইতেই সে এমন কিছু সংগ্রহ করিয়া লইবে, যাহার স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়া সে অবশিষ্ট জীবনভাগ কাটাইয়া দিতে পারে! সুতরাং শচীন্দ্র সেই দিন সন্ধ্যার পর রাখাল বাবু যখন উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, তখন কল্যাণীর শয্যাপ্রান্তে যাইয়া দাঁড়াইল এবং উদ্বেলিতকণ্ঠে ডাকিল,—"কল্যাণী!"

কল্যাণী চক্ষু মেলিয়া চাহিল! শচীন্দ্র উত্তর চাহিয়াছিল,—কল্যাণীর দৃষ্টির মধ্যেই সে তাহার উত্তর পাইল। সে দৃষ্টিতে অনন্ত ভাষা অনন্ত অতৃপ্তি, অনন্ত আকাঙ্ক্ষা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে!

শচীন্দ্র আবার মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "কল্যাণী"—

কল্যাণী এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কথা বলিবার শক্তিসংগ্রহ করিতেছিল,—এইবার আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মৃদু ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল,—"ওখানে—এখানে নহে!"—

একবিন্দু তপ্ত অশ্রু তাহার শীর্ণ পাণ্ডুর কপোল বাহিয়া নামিয়া আসিল।

"কেন, কল্যাণি, এখানেই, এমন একটা কিছু আমাকে দাও, যাহার স্মৃতি লইয়া আমি জীবন কাটাইতে পারি।"—শচীন্দ্র তাহার মুখ নত করিয়া কল্যাণীর মুখের কাছে লইয়া গেল।

কল্যাণী তাহার মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "না। এমন করিয়া তোমার জীবনকে মরুভূমি করিতে পারি না।"—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বড় জোরে কল্যাণীর দীর্ণ বক্ষঃ নিষ্পিষ্ট করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল। কল্যাণী তাহার সমস্ত শক্তিপ্রয়োগ করিয়া সেই নিশ্বাসকে ফিরাইয়া দিল।

শচীন্দ্র একটু ভাবিল,—তাহার পর দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "আমি আমার ন্যায্য প্রাপ্য পাইবার অধিকার চাহিতে আসিয়াছি, কল্যাণি, অনুমতি কর তুমি।"

এইবার কল্যাণী কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার অশ্রু কপোলদ্বয় প্লাবিত করিয়া উপাধান সিক্ত করিল।

কল্যাণী যে তাহার জীবনকে একান্তভাবেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে, এ কথা রাখাল বাবু ও শচীন্দ্র জানিয়াছিলেন।

শচীন্দ্র যখন রাখাল বাবুর কাছে বিবাহ প্রস্তাব করিল, তখন তিনি স্তম্ভিত হইলেন!—সে তাহাকে সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছিল যে, জীবনে আর কোনও নারীই তাহার গ্রহণযোগ্যা হইতে পারে না; সুতরাং যে চলিয়া যাইবে, তাহার কাছ হইতেই যতটুকু স্মৃতি রাখা যায়, সেই-ই তাহার পক্ষে পরম লাভ হইবে! যদি এক-মুহূর্ত্তের জন্যও সে তাহার অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও সে কৃতার্থ হইবে।

এই প্রাণপণ আগ্রহকে রোধ করা রাখাল বাবুর সাধ্যায়ত্ত হইয়া উঠিল না। রাখাল বাবুর অভিমত পাইয়া শচীন্দ্র কল্যাণীর কাছে আসিয়াছিল!

কল্যাণীর অশ্রুপ্লাবিত দৃষ্টির মধ্য হইতে সে তাহার সম্মতিকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই।

১২

সম্প্রদানান্তে রাখাল বাবু কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় বেদনার তপ্ত অশ্রুতে প্লাবিত হইয়া যাইতেছিল।

তখন শচীন্দ্র ধীরে ধীরে কল্যাণীর শয্যার উপর আসিয়া বসিল।

উচ্ছ্‌সিতস্বরে শচীন্দ্র ডাকিল,—"কল্যাণি, প্রিয়া আমার!"

কি সে আহ্বান!—সেই আবেগ-কম্পিত কণ্ঠের প্রিয় আহ্বানটি কল্যাণীর সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত, রোমাঞ্চিত করিয়া দিল। তাহার বুকের মধ্যে বড় চাঞ্চল্য অনুভূত হইতেছিল; শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে অননুভূতপূর্ব্ব স্পন্দনস্রোত বহিয়া যাইতেছিল। সে এই কম্পনকে, এই আবেগকে আর কোনমতেই রোধ করিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার সমস্ত শক্তি, সমস্ত অনুভূতি যেন ধীরে ধীরে তাহার বুকের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিতেছিল।

শচীন্দ্র একটু নত হইয়া কল্যাণীর মুখের কাছে মুখ আনিয়া মৃদুস্বরে আবার ডাকিল,—"কল্যাণি,—প্রিয়তমা আমার!"

এ কি কণ্ঠস্বর! এ কণ্ঠস্বর শুনিলে নয়নপ্রান্ত অশ্রুসিক্ত

হইয়া উঠে,—জীবন স্পৃহণীয় হইয়া উঠে,—আসন্ন-মৃত্যুও বুঝি কিছুকালের জন্য ফিরিয়া দাঁড়ায়!

জীবনকে যে একান্তভাবে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কানের কাছে, হায় শচীন্দ্রনাথ, তুমি এমন করিয়া প্রেমাবেগ-কম্পিতকণ্ঠে কেন ডাকিলে?

তখন কল্যাণী তাহার শীর্ণ দক্ষিণ বাহু দিয়া শচীন্দ্রের কণ্ঠ বেষ্টিত করিল! কিন্তু চোখের কাছে ও কিসের আঁধার ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে?

শচীন্দ্র তাহার মুখ আরও নত করিয়া আনিল,—কল্যাণীর সূক্ষ্ম পাণ্ডুর অধরে স্বীয় তপ্ত স্ফুরিতাধর স্থাপিত করিল।

কল্যাণী একটু শিহরিয়া উঠিল;—তাহার সর্ব্বাঙ্গ একবার কাঁপিল;—তাহার পর বক্ষের স্পন্দনটা দ্রুত হইয়া উঠিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল!—কণ্ঠার্পিত শিথিল বাহু ধীরে ধীরে শয্যার উপর পড়িয়া গেল।

চকিত শচীন্দ্রনাথ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কল্যাণীর পাণ্ডুর ওষ্ঠপুট আরও পাণ্ডুর হইয়াছে! আর, সেই প্রাপ্তপ্রথমচুম্বনের গৌরবের মধ্যেই কল্যাণী তাহার মুকুলিত যৌবনের সমগ্র সাধ ও আশা তাহার প্রিয়তমের কাছে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া দিয়াছে; তাহার মুখশ্রী কৃতার্থতার গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

সমাপ্ত

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীর অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালাদেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালাদেশের লোক—ভাল জিনিসের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা বাঙ্গালা দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্ত্তিকুশল গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সারবান্, সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্বপ্রকাশিত পুস্তকগুলি এইরূপ সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের এ চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী' ও 'পল্লী-সমাজের' এই কয়েক মাসের মধ্যে তৃতীয় সংস্করণ এবং 'বড়বাড়ী', 'অরক্ষণীয়া' ও 'ধর্ম্মপালের' দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

যে আশা লইয়া এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, ভগবৎপ্রসাদে ও সহৃদয় পাঠকবর্গের অনুগ্রহে আমাদের সে আশা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছে। "ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে।" শ্রম সার্থক হইলে হৃদয়ে নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। আমরাও অনেক কার্য্যের কল্পনা করিতেছি। এই সিরিজের উত্তরোত্তর উন্নতির সহিত একে একে সেই সঙ্কল্পগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালাদেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ সুলভ সুন্দর সংস্করণের আমরাই সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। আমরা অনুরোধ করিতেছি, প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া এই 'সিরিজে'র স্থায়িত্ব সম্পাদন ও আমাদের উৎসাহবর্দ্ধন করুন।

কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না, নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিলেই আমরা যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে, সেইখানি ভি, পি ডাকে প্রেরণ করিব। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; গ্রাহকের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে আমাদিগকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণ ছাপাইয়া অধিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না।

এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে—

১। অভাগী (তৃতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন
২। ধর্ম্মপাল (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ
৩। পল্লী-সমাজ (তৃতীয় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪। কাঞ্চনমালা (ছাপা নাই) মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫। বিবাহবিপ্লব—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল্
৬। চিত্রালি—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এল্
৭। দুর্ব্বাদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত
৮। শাশ্বত ভিখারী—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় পি-আর এস্
৯। বড়বাড়ী (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন
১০। অরক্ষণীয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১১। ময়ূখ—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ
১২। সত্য ও মিথ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
১৩। রূপের বালাই—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়
১৪। সোণার পদ্ম—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ
১৫। লাইকা—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী
১৬। আলেয়া—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী
১৭। বেগম সমরু— (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮। নকল পাঞ্জাবী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত
১৯। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত
২০। হালদারবাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী (যন্ত্রস্থ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা